بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদঃ একটি পর্যালোচনা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত এ প্রবন্ধটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত

১. সাধারণ পরিচিতি

১. ১. জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস

জঙ্গি, জঙ্গিবাদ, জঙ্গিবাদী শব্দগুলি ইংরেজি (militant, militancy) শব্দগুলির অনুবাদ। ইদানিং এগুলি আমাদের মধ্যে অতি পরিচিত ও অতিব্যবহৃত। শব্দগুলি কিছু দিন আগেও এত প্রচলিত ছিল না। আর আভিধানিক বা ব্যবহারিকভাবে এগুলি নিন্দনীয় বা খারাপ অর্থেও ব্যবহৃত হতো না। শাব্দিক বা রূপক ভাবে যোদ্ধা, সৈনিক বা যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্তু বুঝাতে এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হতো। বৃটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে 'জঙ্গিলাট' বলা হতো।[১]

শক্তিমত্ত বা উগ্র বুঝাতেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। (Oxford Advanced Learner's Dictionary)-তে বলা হয়েছেঃ militant. adj. favouring the use of force or strong pressure to achieve one's aim. ...militant: n. militant person, esp. in politics[২]. Merriam-Wepster's Collegiate Dictionary--তে বলা হয়েছেঃ militant 1: engaged in warfare or combat : fighting. 2: aggressively active (as in a cause).

এ সকল অর্থ কোনোটিই বে-আইনী অপরাধ বুঝায় না। কিন্তু আমরা বর্তমানে 'জঙ্গি' বলতে বুঝি রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে বে-আইনী ভাবে নিরপরাধ বা অযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, হত্যা ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তি। আর এদের মতবাদকেই আমরা জঙ্গিবাদ বলি। এই অর্থে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত পরিভাষা সন্ত্রাস।

সন্ত্রাস-এর পরিচয়ে এনসাইক্লোপিডীয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছেঃ "terrorism: the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective. সন্ত্রাসঃ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশৃঙ্খলভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠির মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা।"

মার্কিন সরকারের ফেডারেল বুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি. আই) terrorism বা সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলেছেঃ "the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives: কোনো সরকার বা সাধারণ নাগরিকদেরকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার করা।"

এই সংজ্ঞায় মূল কর্মের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শক্তি, ক্ষমতা বা সহিংসতার ব্যবহার যদি বে-আইনী হয় তবে তা 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে। আর যদি তা 'আইন-সম্মত' হয় তবে তা 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে না। এখানে সমস্যা আইন ও বে-আইন নির্ণয় নিয়ে। এভাবে আমরা দেখছি যে, এভাবে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা কঠিন এবং এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ প্রায় অসম্ভব। এজন্য অন্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী কর্মের উপর নির্ভর না করে আক্রান্তের উপর নির্ভর করে সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের ভাষায়ঃ "terrorism is premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets: রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে অযোদ্ধা লক্ষ্যের বিরুদ্ধে সহিংসতা সন্ত্রাস।"

যুদ্ধের ক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ প্রতিপক্ষের সৈন্য ও নাগরিকদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারে সচেষ্ট থাকে। তবে সন্ত্রাসের সাথে যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য হলো, সাধারণ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই যোদ্ধারা মুলত যোদ্ধা বা যুদ্ধ বিষয়ক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সচেষ্ট থাকে এবং সামরিক বিজয়ই লক্ষ্য থাকে। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে সামরিক বিজয় উদ্দেশ্য থাকে না। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যই হলো সামরিক অসামরিক নির্বিচারে সকল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।

"Terrorism proper is thus the systematic use of violence to generate fear, and thereby to achieve political goals, when direct military victory is not possible. This has led some social scientists to refer to guerrilla warfare as the 'weapon of the weak' and terrorism as the 'weapon of the weakest': এজন্য মূলত সন্ত্রাস হলো যেখানে সামরিক বিজয় সম্ভব নয় সেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সুশৃঙ্খলিতভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে ভীতি সঞ্চার করা। এজন্য কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন যে, গেরিলা যুদ্ধ হলো দুর্বলের অস্ত্র এবং সন্ত্রাস হলো দুর্বলতমের অস্ত্র।"[৩]

---

[১] শ্রী শৈলেন্দ বিশ্বাস, সংসদ বাংলা-ইংরেজি অভিধান (কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯) পৃ ৪৬২।
[২] A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University Press, 5th edition, 1995), page 738.
[৩] Encyclopaedia Britannica, CD Version, 2005, Article: Terrorism.

www.assunnahtrust.com

১. ২. সন্ত্রাসের উৎপত্তি

প্রাচীন যুগ থেকেই বিভিন্ন দল, গোষ্ঠি ও রাষ্ট্র সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। তবে মানব ইতিহাসে প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধতম সন্ত্রাসী কর্ম ছিল উগ্রপন্থী ইহূদী যীলটদের (Zealots) সন্ত্রাস। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাসরত ইহূদী উগ্রবাদী এ সকল ইহূদীরা নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক সাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপোসহীন ছিল। যে সকল ইহূদী রোমান রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করত বা সহঅবস্থানের চিন্তা করত এরা তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করত। এজন্য এরা সিকারী (the Sicarii: dagger men) বা ছুরি-মানব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এরা প্রয়োজনে আত্মহত্যা করত কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে ধরা দিত না।[৪]

২. ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া সাধারণভাবে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এক প্রকারের যুদ্ধ। তবে যুদ্ধের সাথে এর পার্থক্য হলো: যুদ্ধ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের দাবিদার কর্তৃক পরিচালিত হয়, ফলে সেক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহারের বৈধতা বা আইনসিদ্ধতার দাবি করা হয়। এতে সাধারণত যোদ্ধাদেরকে লক্ষ্যবস্তু করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য হয় সামরিক বিজয়। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা দল রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নয়। তবে তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চায়। এ জন্য তারা যোদ্ধা-অযোদ্ধা সবাইকে নির্বিচারে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি করতে থাকে। যেন এক পর্যায়ে ভীত হয়ে সংশ্লিষ্ট সরকার ও জনগণ অভিষ্ট 'রাজনৈতিক পরিবর্তন' করতে রাজি হয়। সাধারণভাবে যারা সম্মুখ বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর সামরিক বিজয় লাভ করতে পারবে না বলে মনে করেন তারাই এরূপ সন্ত্রাসের আশ্রয় নেন। আমরা দেখেছি যে, প্রাচীন যুগ থেকে ইহূদী উগ্রবাদী ধার্মিকগণ 'ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন। মধ্যযুগে খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা আমরা দেখতে পাই। বিশেষত ধর্মীয় সংস্কার, পাল্টা-সংস্কার (both the Reformation and the Counter-Reformation)-এর যুগে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে অগণিত যুদ্ধ ছাড়াও যুদ্ধ বহির্ভূত সন্ত্রাসের অনেক ঘটনা দেখা যায়।[৫]

পক্ষান্তরে ইসলামের ইতিহাসে আমরা যুদ্ধ দেখতে পেলেও সন্ত্রাস খুবই কম দেখতে পাই। এ জাতীয় যে সামান্য কিছু ঘটনা আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে অন্যতম খারিজীদের কর্মকাণ্ড ও বাতিনী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড। সমকালিন জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের কারণ ও প্রতিকার জানার জন্য এদের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা অপরিহার্য; কারণ কারণ ও তত্ত্ব সকল দিক থেকেই আধুনিক জঙ্গিবাদ প্রাচীন জঙ্গিবাদের সাথে একই সূত্রে বাঁধা।

২. ১. খারিজী সম্প্রদায়

২. ১. ১. উৎপত্তি ও ইতিহাস

ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাসী গ্রুপের উত্থানের প্রথম ঘটনা আমরা দেখতে পাই খারিজী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে। ৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হযরত উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে হযরত আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর হযরত মু'আবিয়া (রা) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহ যুদ্ধে রূপান্তারিত হয়। সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন। এই পর্যায়ে আলীর (রা) অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে 'খারিজী' দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সরাদিন যিক্‌র ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা 'কুর্‌রা' বা 'কুরআনপাঠকারী দল' বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর বিধান অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ.

"মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[৬]

এখানে আল্লাহ দ্ব্যথহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সীমালঙ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না আসে। মু'আবিয়ার দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে মানুষকে সালিস করার ক্ষমতা প্রদান অবৈধ।

এছাড়া কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে: إن الحكم إلا لله

'কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহরই' বা "বিধান শুধু আল্লাহরই।"[৭]

---

[৪] Encyclopaedia Britannica, Articles: Terrorism & article: Zealot

[৫] Encyclopaedia Britannica, Articles: Terrorism & Ideology.

[৬] সূরা হুজুরাত, ৯ আয়াত।

[৭] সূরা আনআম, ৫৭ আয়াত, সূরা ইউসূফ, ৪০ ও ৬৭ আয়াত।

www.assunnahtrust.com

কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কুরআন কারীমে আরো এরশাদ করা হয়েছে,

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"[৮]

আর আলী ও তার অনুগামীগণ যেহেতু আল্লাহর নাযিল করা বিধান মত মু'আবিয়ার সাথে যুদ্ধ না চালিয়ে, সালিসের বিধান দিয়েছেন, সেহেতু তাঁরা কাফির। তারা দাবি করেন, আলী (রা), মু'আবিয়া (রা) ও তাঁদের অনুসারীগণ সকলেই কুরআনের আইন অমান্য করে কাফির হয়ে গিয়েছেন। কাজেই তাদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।[৯]

সালিসি ব্যবস্থা আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বৎসর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা ৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয়। ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর (রা) দল ত্যাগ করেন। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল।[১০]

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। আরবী সাহিত্যে এদের কবিতা ইসলামী জযবা ও জিহাদী প্রেরণার অতুলনীয় ভাণ্ডার।[১১] এদের ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সাজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালে কড়া পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসতো।[১২] কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা আল্লাহর ভয়ে, আখিরাতের ভয়ে ও আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত। পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। অনেক নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের কারণে।[১৩]

৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের সন্ত্রাস, হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে। কারণ তাদের মতে, তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন উসমান ও আলীকে কাফির বলে মানতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তার বিরোধিতা শুরু করে।

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবি ছিল, উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান করেছন। এছাড়া মু'আবিয়া ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন। যেমন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের এ দাবী না মানাতে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[১৪]

এরা ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে 'পিউরিটান' ধারণা লালন করত। তারা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। এজন্য তারা এইরূপ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠা' বা রাজনৈতিক পর্যায়ে ইসলামী বিধিবিধান পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। পাশাপশি এই মহান উদ্দেশ্যে (!) যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্র গুপ্ত হত্যা করে। এছাড়া তারা আলীকে কাফির মনে করেন না এরূপ সাধারণ অযোদ্ধা পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করতে থাকে।[১৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ সাহাবী আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা) এর মধ্যকার রাজনৈতিক মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন, "যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে ১০০ জন সাহাবীও এতে অংশ গ্রহণ করেন নি। বরং এতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ৩০ জনেরও কম ছিল।"[১৬]

---

[৮] সূরা মায়িদা, ৪৪ আয়াত।

[৯] নাসাঈ, আহমদ ইবনু শু'আইব (৩০৪হি), আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১) ৫/১৬৫-১৬৬; ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক (রিয়াদ, মারকাযুল মালিক ফায়সাল, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৮), পৃ. ৪৭-৪৮।

[১০] ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪হি.), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬) ৫/৩৮০-৪৩০; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭), পৃ. ৫৯।

[১১] বিস্তারিত দেখুন, মুবাররিদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৮৫হি), আল-কামিল (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)।

[১২] ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), তালবীসু ইবলিস (বৈরুত, দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৪), পৃ. ৮৩-৮৪।

[১৩] আল-আজুর্‌রী, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (৩৬০হি), আশ-শারী'আহ (রিয়াদ, মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১ম মুদ্রণ ১৯৯২), পৃ. ৩৭।

[১৪] ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

[১৫] আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮) ৫/১১০, ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৭৮-৩৯১; ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৫১-৬১।

[১৬] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৫১।

www.assunnahtrust.com

এ সকল সাহাবী ও অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়গণ নৈতিকভাবে আলীর (রা) কর্ম সমর্থন করতেন। তাকে পাপী বা ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘনকারী বলতে কখনোই রাজি হতেন না। খারিজীগণ এদেরকেও কাফির বলে গণ্য করত এবং হত্যা করত।

সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাত-এর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর স্ত্রী পরিজনদের নিয়ে পথে চলছিলেন। খারিজীগণ তাঁকে উসমান (রা) ও আলী (রা) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি তাঁদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেন। তখন তারা তাঁকে নদীর ধারে নিয়ে জবাই করে এবং তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী ও কাফিলার অন্যান্য নারী ও শিশুকে হত্যা করে। এসময়ে তারা একস্থানে বিশ্রাম করতে বসে। তথায় একটি খেজুর গাছ থেকে একটি খেজুর ঝরে পড়লে একজন খারিজী তা তুলে নিয়ে মুখে দেয়। তখন অন্য একজন বলে, তুমি মূল্য না দিয়ে পরের দ্রব্য ভক্ষণ করলে? লোকটি তাড়াতাড়ি খেজুরটি উগরে দেয়। আরেকজন খারিজী একটি শূকর দেখে তার দেহে নিজের তরবারী দিয়ে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ তার বন্ধুরা প্রতিবাদ করে বলে, এতো অন্যায়, তুমি এভাবে আল্লাহর যমিনে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছ ও পরের সম্পদ নষ্ট করছ! তখন তারা শূকরের অমুসলিম মালিককে খুঁজে তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়।[১৭]

২. ১. ২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এদের ধার্মিকতা ও উগ্রতার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের সালাতের পাশে তোমাদের সালাত তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যাদের সিয়ামের পাশে তোমাদের সিয়াম তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যাদের নেককর্মের পাশে তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যারা কুরআন পাঠে রত থাকবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য দিক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, তেমনিভাবে তারা দীনের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যাবে।"[১৮]

এই অর্থে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধার্মিকতা, সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। এ সকল হাদীস যদিও সর্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে, তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ সকল- প্রায় অর্ধশত- হাদীস থেকে আমরা এদের বিভ্রান্তির কারণ ও এদের কিছু বৈশিষ্ট্য জানতে পারি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, ইয়ামান থেকে আলী (রা) মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত স্বর্ণ ৪ জন নওমুসলিম আরবীয় নেতার মধ্যে বণ্টন করে দেন। তখন বসা চক্ষু, উচু গাল, বড় কপাল ও মুণ্ডিত চুল, যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে:

يا رسول الله اتق الله (ما عدلت) قال ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله (من يطع الله إذا عصيت، من يعدل إذا لم أعدل، أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنونني) قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله ﷺ إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم) يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد

হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি তো বে ইনসাফি করলেন! তিনি বলেন, দুর্ভোগ তোমার! পৃথিবীর বুকে আল্লাহকে ভয় করার সবচেয়ে বড় অধিকার কি আমার নয়? আমি যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করি বা বে-ইনসাফি করি তবে আল্লাহর আনুগত্য এবং ন্যায় বিচার আর কে করবে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করলেন, আর তোমরা আমার বিশ্বস্ততায় আস্থা রাখতে পারছ না! এরপর লোকটি চলে গেল। তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি লোকটিকে (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি অবিশ্বাস ও কুধারণা পোষণ করে ধর্মত্যাগ ও কুফরী করার অপরাধে) মৃত্যুদণ্ড প্রদান করব না? তিনি বলেন, না। হয়তবা লোকটি সালাত আদায় করে। খালিদ (রা) বলেন, কত মুসল্লীই তো আছে যে মুখে যা বলে তার অন্তরে তা নেই। তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নি যে, আমি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখব বা তাদের পেট ফেড়ে দেখব। অতঃপর তিনি গমনরত উক্ত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, এই ব্যক্তির অনুগামীদের মধ্যে এমন একদল মানুষ বের হবে যারা সদাসর্বদা সুন্দর-হৃদয়গ্রাহীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবে, অথচ কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের সালাত দেখে তোমাদের মধ্যকার একজন মানুষ নিজের সালাতকে ঘৃণা করবে, তাদের সিয়াম দেখে তোমাদের মধ্যকার একজন মানুষ নিজের সিয়ামকে ঘৃণা করবে। তীর যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে চলে যায়, এরাও তেমনি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে চলে যাবে। তারা ইসলামে অনুসারীদের হত্যা করবে এবং প্রতিমা-পাথরের অনুসারীদের ছেড়ে দেবে। আমি যদি তাদেরকে পাই তবে আদ সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্মুল করা হয়েছিল সেভাবেই আমি তাদেরকে হত্যা করে নির্মুল করব।[২০]

---

[১৭] ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ ৮৪-৮৫।

[১৮] বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭) ৪/১৯২৮, ৬/২৫৪০; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি), আস-সহীহ (কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা) ২/৭৪৩।

[১৯] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৯৩-৪১১।

[২০] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২১৯, ১৩২১, ৪/১৫৮১, ১৭১৪, ৫/২২৮১, ৬/২৫৪০, ২৭০২; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৪১-৭৪৪।

www.assunnahtrust.com

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, যুল খুওয়াইসিরা বা হুরকূস নামক এই ব্যক্তি খারিজীদের গুরুজনদের একজন ছিল।[২১]

এখানে এই ব্যক্তি ও তার অনুসারীদের বিভ্রান্তির মূল কারণটি প্রতিভাত হয়েছে। তা ছিল ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে নিজের বুঝকে একমাত্র সঠিক বলে মনে করা এবং এই বুঝের বিপরীত সকলকেই অন্যায়কারী বলে মনে করা। এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করেছেন। তিনি সকল যোদ্ধার মধ্যে বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে তা বণ্টন না করে অল্প কয়েকজনকে তা দিয়েছেন। এতে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে মুমিন নিজের মনকে বুঝাতে পারেন যে, নিশ্চয় কোনো বিশেষ কারণে বা আল্লাহর বিশেষ নির্দেশেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা করেছেন। অথবা তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অন্যায়কারী বলে কল্পনা করতে পারেন না বা তাঁকে 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ' করতে পারেন না। কিন্তু এই ব্যক্তি দীনকে বুঝার ব্যাপারে নিজের জ্ঞানকেই চূড়ান্ত মনে করেছে। সে তার জ্ঞান দিয়ে অনুভব করেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন এবং তৎক্ষণাৎ সে 'সত্য ও দীন প্রতিষ্ঠা'-র লক্ষ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহকে ভয় করতে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছে!

এখানে ইসলামের নামে বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসী কর্মের মূল একটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো, এরা এদের সকল সন্ত্রাসী কর্ম মূলত 'মুসলিমদের' বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। 'মুরতাদ', 'কাফির' ইত্যাদি অভিযোগে এরা মুসলিমদেরকে হত্যা করে।

আলী (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء (أحداث) الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، (يقولون من قول خير البرية) (يتكلمون بالحق) يمرقون من الإسلام (من الحق) كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فإذا لقيتموهم (فأينما لقيتموهم) فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة

শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা, বোকামি ও প্রগভতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। তারা সর্বোত্তম মানুষের কথা বলবে। তারা সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে।[২২]

এখানে ইসলামের নামে বা সত্য, ন্যায় ও হক্ক প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীকর্মে লিপ্ত মানুষদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে:

প্রথমত, এরা অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের। 'যুল খুওয়াইসিরা'র মত দুচার জন বয়স্ক মানুষ এদের মধ্যে থাকলেও এদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি সবই যুবক বা তরুণদের হাতে। সমাজের বয়স্ক ও অভিজ্ঞ আলিম ও নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব বা পরামর্শ এরা মূল্যায়ন করে না।

দ্বিতীয়ত, এদের বুদ্ধি অপরিপক্ক ও প্রগলভতাপূর্ণ। আমরা আগেই দেখেছি যে, সকল সন্ত্রাসই মূলত রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আর রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অস্থিরতা ও অদুরদর্শিতা সন্ত্রাসী কর্মের অন্যতম কারণ। অপরিপক্ক বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার অভাব ও দূরদর্শিতার কমতির সাথে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার এ সকল সত্যান্বেষী ও ধার্মিক যুবককে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছিল।

এদের বিদ্রোহের পরে হযরত আলী (রা) এদেরকে বুঝিয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাদের নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখলে একপর্যায়ে আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় এবং অনেকে নিহত হয়। বাকিরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জমায়েত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেহেতু আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) মুসলিম উম্মাহকে খোদাদ্রোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই জাতি এই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এজন্য আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম নামে একব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাঁকে আঘাত করে। আলীর (রা) শাহাদতের পরে তাঁর উত্তেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রাহমানের হস্তপদ কর্তন করে তখন সে মোটেও কষ্ট প্রকাশ করে না, বরং আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা তার জিহ্বা কর্তন করতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি চাই যে, আল্লাহর যিক্র করতে করতে আমি শহীদ হব![২৩]

আলীকে (রা) এভাবে গুপ্ত হত্যা করাতে আব্দুর রাহমানকে প্রশংসা করে তাদের এক কবি ইমরান ইবনু হিত্তান (মৃত্যু ৮৪ হি) বলেন: "কত মহান ছিলেন সেই নেককার মুত্তাকি মানুষটি, যিনি সেই মহান আঘাতটি করেছিলেন! সেই আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চান নি। আমি প্রায়ই তাঁর স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ তিনিই।"[২৪]

আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী এদের নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার কারণে এদের প্রতি অত্যন্ত দরদ অনুভব করতেন। তাঁরা এদেরেকে উগ্রতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা তাদের 'ব্রান্ডের' ইসলাম বা ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। আলীকে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিক্র করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর

---

[২১] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৪০৫।

[২২] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩২১, ৪/১৯২৭; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৪৬; তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী) ৪/৪৮১; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/১৬১।

[২৩] মুবাররিদ, আল-কামিল ৩/১১২০।

[২৪] মুবাররিদ, আল-কামিল ৩/১০৮৫।

www.assunnahtrust.com

যিক্‌রে লিপ্ত। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে।[২৫]

২. ১. ৩. বিভ্রন্তির কারণ ও প্রকাশ

২. ১. ৩. ১. জ্ঞানের অহঙ্কার

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের এই ঘটনা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞানের অহঙ্কারই ছিল তাদের বিভ্রান্তির উৎস। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ উগ্রতা ও সন্ত্রাসে লিপ্তদের দুটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন: তারুণ্য এবং বুদ্ধির অপরিপক্কতা বা হটকারিতা। এ কারণে তারা ইসলাম বুঝার ক্ষেত্রে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত মনে করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজীবনের সহচর ও দীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী সাহাবীগণের মতামতকে অবজ্ঞা করা বা তাদের পরামর্শ গ্রহণকে তারা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করত। তাদের বুঝের বাইরে মতপ্রকাশকারীদেরকে ঢালাওভাবে তারা অবজ্ঞা করত।[২৬]

এছাড়া তারা কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাতের গুরুত্ব অস্বীকার করে। তারা হাদীস একেবারে অস্বীকার করত না। কখনো কখনো সাহাবীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে তারা হাদীস শিক্ষার জন্য গমন করত ও প্রশ্ন করত।[২৭] কিন্তু তারা ইসলামী জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে কুরআনকেই যথেষ্ট বলে মনে করত। রাতদিন তারা কুরআন পাঠ ও চর্চায় রত থাকত। কুরআন বুঝার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিগত কর্ম, ব্যাখ্যা বা হাদীসের গুরুত্ব তারা অস্বীকার করত। কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ যা তারা বুঝতো তাকেই চূড়ান্ত বলে মনে করত।[২৮]

শুরু থেকেই সাহাবীগণ এদের বিভ্রান্তির কারণ উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য তারা 'সুন্নাত'-এর মাধ্যমে তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করতেন। আলী (রা) যখন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে (রা) তাদের বুঝানোর জন্য পাঠান তখন তিনি বলেন, "তুমি তাদের কাছে যেয়ে তাদের সাথে আলোচনা-বিতর্কে লিপ্ত হও। তাদের সাথে কুরআন দিয়ে বিতর্ক করো না; কারণ কুরআন বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। বরং তুমি সুন্নাত দিয়ে তাদের সাথে বিতর্ক করবে।... ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, কুরআনের জ্ঞান তাদের চেয়ে আমার বেশি, আমাদের বাড়িতেই তো কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আলী (রা) বলেন, তুমি সত্য বলেছ। তবে কুরআন বিভিন্ন প্রকারের অর্থ ও ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে, আমরাও কুরআনের কথা বলব এবং তারাও কুরআনের কথা বলবে। কিন্তু তুমি সুন্নাত দিয়ে তাদের সাথে বিতর্ক করবে; তাহলে তারা তা প্রত্যাখ্যাণ করার কোনো পথ পাবে না।[২৯]

উপর্যুক্ত বিভ্রান্তি থেকে তারা কয়েকটি বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যেগুলির কারণে তারা তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠা'র জিহাদ বলে মনে করে।

২. ১. ৩. ২. মুসলিমকে কাফির বলা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, খারিজীদের বিদ্রোহ, উৎপত্তি ও বিকাশের প্রথম সূত্র ছিল, কুরআন কারীমের কিছু আয়াতের আলোকে আল্লাহর বিধানমত ফয়সালা না দেওয়ার কারণে আলী ও তাঁর অনুগামীদেরকে কাফির বলা। এটিই ছিল খারিজীদের প্রথম মূলনীতি। তারা কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে দাবি করে যে, মুসলিম পাপে লিপ্ত হলে সে কাফির বা ঈমান হারা হয়ে যায়। তাদের মতে ইসলামের অনুশাসন অনুসরণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো অনুশাসন লঙ্ঘন করে সে ঈমানহারা বা কাফিরে পরিণত হয়। ঈমান ও কুফরের মাঝে আর কোনো মধ্যম অবস্থা নেই। কাজেই যার ঈমানের পুর্ণতা নষ্ট হবে সে কাফিরে পরিণত হবে।[৩০]

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, অনেক বিষয় আছে যা কুরআন হাদীসের আলোকে স্পষ্টতই পাপ। যেমন, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার ইত্যাদি। খারিজীগণ শুধু এগুলিকেই কুফরী বলে গণ্য করেনি। উপরন্তু, তাদের মতের বিপরীত রাজনৈতিক কর্ম বা সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে 'পাপ' বলে গণ্য করেছে, এরপর তারা সেই পাপকে কুফরী বলে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে খারিজীগণের কাফির-কথনের মূল ভিত্তি 'পাপ' নয়, বরং 'রাজনৈতিক মতাদর্শ'। তারা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় এরূপ সকল মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করত।

আলী (রা) ও তাঁর পক্ষের মানুষেরা এবং অন্যান্য যে সকল সাহাবী ও সাধারণ মুসলিম আলীকে কাফির বা ইসলামের বিধান লঙ্ঘনকারী বলে মানতে রাজি ছিলেন না, তারা কেউ চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার বা কুরআন নির্দেশিত অনুরূপ কোনো পাপ বা অপরাধে লিপ্ত হন নি। আলী (রা) তাঁর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রক্তপাত বন্ধ করতে সালিসের বা আপোসের চেষ্টা করেছেন। তাঁর কর্মের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের সমর্থন রয়েছে। অন্য অনেকে তার সাথে তার কর্মে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর কর্মের যৌক্তিকতা অনুভব করেছেন। খারিজীগণ তাদের মনগড়া ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এদের সকলকেই কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে। এতেই তারা খান্ত হয় নি, তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং তাদের ধনসম্পদ লুটতরাজ করে ইসলাম বা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছে। পক্ষান্তরে তাদের অনেকেই তাদের মধ্যকার অনেক পাপীকেই কাফির মনে করত না।[৩১]

২. ১. ৩. ৩. কাফির হত্যার ঢালাও বৈধতা দাবি করা

কাউকে কাফির বলে গণ্য করা আর তাকে হত্যা করা কখনোই এক বিষয় নয়। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারব যে, একমাত্র যুদ্ধরত কাফির ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করার কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। কিন্তু খারিজীরা সাহাবীগণ ও সাধারণ মুসলিমদেরকে কাফির

---

[২৫] ইবনুল আসীর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারাক (৬০৬ হি), আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস (বৈরত, দারুল ফিকর) ২/১৪৯

[২৬] ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ ৮১-৮৭।

[২৭] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৪৪-১৪৪৬; হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫হি), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০) ২/৪০৪, ৪৪০, ৪৪৫, ৪/৬১৭; ইবনু হাজার আসকালানী, আহমাদ ইবনু আলী (৮৫২ হি), ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি) ৮/৩১০, ৫৫৭, ৬৮৬।

[২৮] ইবনু তাইমিয়া, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮হি), মাজমূউল ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১) ১৩/৪৮, ৪৯, ১৯/৭২।

[২৯] সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন আব্দুর রাহমান (৯১১হি), মিফতাহুল জান্নাত (মদীনা মুনাওয়ারা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় প্রকাশ, ১৩৯৯হি), পৃ. ৫৯।

[৩০] বাগদাদী, আব্দুল কাহির ইবনু তাহির (৪২৯ হি), আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক (বৈরুত, দারুল মারিফাহ), পৃ. ৭২-৭৪; ইবনু আবিল ইয্য (৭৯২ হি), শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮), পৃ. ৩১৬-৩২৫; ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৬৩-৬৫; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৭ হি), পৃ. ২০, ৪২।

[৩১] বাগদাদী, আল-ফারক, পৃ.৭২-৭৩; ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৬৩-৮১।

www.assunnahtrust.com

বলেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা তাদেরকে ঢালাওভাবে হত্যা করার বৈধতা দাবি করেছে। তারা মুসলিমদের দেশগুলিকে 'দারুল কুফর' বা অনৈসলামিক রাষ্ট্র বলে গণ্য করেছে এবং এ সকল দেশের নাগরিকদেরকে ঢালাওভাবে হত্যা ও লুণ্ঠন করার বৈধতা ঘোষণা করেছে। তবে এক্ষেত্রে তারা বিশেষভাবে এ সকল দেশের মুসলিমদেরকেই হত্যা করেছে এবং অমুসলিম নাগরিকদের হত্যা থেকে সাধারণত বিরত থেকেছে।[৩২]

২. ১. ৩. ৪. রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্য সম্পর্কে অসচ্ছ ধারণা

ইসলামের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচ্ছিন্ন কবীলা বা গোত্র কেন্দ্রিক আরব সমাজকে বিশ্বের সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে আনেন। আরবরা রাষ্ট্রিয় আনুগত্য বুঝতো না। তারা বুঝতো কবীলা বা গোত্র প্রধানের আনুগত্য। বিচ্ছিন্নভাবে ছোট বা বড় গোত্রের অধীনে তারা বাস করত। গোত্রের বাইরে কারো আনুগত্য বা অধীনতাকে তারা অবমাননাকর বলে মনে করত। এছাড়া ব্যক্তি-সাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতাবোধ ইত্যাদি তাদেরকে তাদের মতের বাইরে সকল সিদ্ধান্ত অমান্য করতে প্রেরণা দিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বিচ্ছিন্ন জাতিকে প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি এজন্য বারবার তাদেরকে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা 'আল-জামা'আত', রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য বা 'আল-ইমাম', বা 'আল-আমীর' রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ বা 'বাইয়াত' ইত্যাদির বিষয়ে তাঁর অগণিত সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য বর্জন করা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে বা রাষ্ট্রহীনভাবে বাস করাকে তিনি জাহিলী জীবন ও এই প্রকারের মৃত্যুকে জাহিলী মৃত্যু বলেছেন। পছন্দ হোক বা না হোক রাষ্ট্র প্রশাসনের আনুগত্য করতে হবে। কোন অবস্থাতেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। প্রয়োজনে রাষ্ট্র প্রধানকে সৎকাজে আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ও সংশোধন করতে হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ ও হানাহানি তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

সুন্নাতে নববী ও সাহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে থেকে কুরআন ও ইসলাম বুঝতে যেয়ে খারিজীগণ এক্ষেত্রে মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়। 'ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ'-এর নামে শক্তিপ্রয়োগ করে তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়। এছাড়া তারা রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তাও বুঝতে অক্ষম হয়। তারা শুধু বলতো 'কর্তৃত্ব বা বিধান কেবলমাত্র আল্লাহরই'। এদ্বারা তারা বুঝাতো, আল্লাহ ছাড়া কোনো শাসন বা কতৃত্ব চলবে না। আল্লাহর বিধান যে যেভাবে বুঝবে সেভাবে পালন করবে।

এজন্য তাদের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে আলী (রা) বলেন, "তারা একটি সঠিক কথাকে ভুল অর্থে প্রয়োগ করছে। তারা বলছে 'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই বা কর্তৃত্ব নেই।' কিন্তু তারা বুঝাচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কারো শাসন নেই। কিন্তু মানুষের জন্য তো পুণ্যবান বা পাপী একজন শাসক প্রয়োজন। তার শাসনাধীনে মুমিন কর্ম করবে এবং পাপীও নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। এভাবেই আল্লাহর নির্ধারিত সময় পূর্ণ হবে। যিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন, জনগণের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এবং সবল থেকে দুর্বলের অধিকার আদায় করবেন। এভাবে সৎ মানুষেরা শান্তি পাবে এবং অপরাধীরা দমিত হবে।"[৩৩]

এভাবে প্রথমে খারিজীগন রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদির কোনো গুরুত্ব স্বীকার করত না। পরবর্তীতে কেউ কেউ তাদেরকে রাষ্ট্র, ইমাম, বাইয়াত ইত্যাদির গুরুত্বের বিষয়ে বললে তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে 'আমীর' বা ইমাম বলে 'বাইয়াত' করে নেয়। এভাবে তারা রাষ্ট্রীয় পরিভাষাগুলিকে 'দলের' ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র বিষয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের জন্ম নেয়।[৩৪]

২. ১. ৩. ৫. জিহাদকে ইসলামের রুকন ও ব্যক্তিগত ফরয বলে গণ্য করা

কুরআন-হাদীসে অগণিত স্থানে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং জিহাদের জন্য মহান পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ছাড়াও মুসলিম-অমুসলিম সকলের মধ্যে 'সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করতে' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্তির ফলে খারিজীগণ রাষ্ট্রীয় ফরয ও ব্যক্তিগত ফরযের মধ্যে কোনো পার্থক্য করত না। তারা জিহাদ ও 'আদেশ নিষেধ' বিষয়ক কুরআনী নির্দেশনার আলোকে প্রচার করে যে, জিহাদ ও আদেশ-নিষেধ ইসলামের রুকন ও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।

"The second principle that flowed from their aggressive idealism was militancy, or jihād, which the Khawārij considered to be among the cardinal principles, or pillars, of Islām. Contrary to the orthodox view, they interpreted the Qurānic command about 'enjoining good and forbidding evil' to mean the vindication of truth through the sword"... "To these five, the Khawārij sect added a sixth pillar, the jihād".

"খারিজীদের আগ্রাসী আদর্শবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল জঙ্গিবাদ বা জিহাদ। খারিজীগণ জিহাদকে ইসলামের মূল ভিত্তি বা রুকন বলে মনে করে। সাধারণ মুসলিমদের মতের বিপরীতে খারিজীগণ কুরআন নির্দেশিত 'সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ' বলতে তরবারীর জোরে সত্য প্রতিষ্ঠা বুঝাতো।... তারা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সাথে জিহাদকে ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে যুক্ত করে...।"[৩৫]

প্রকৃতপক্ষে তারা 'জিহাদ'-কে ইসলামের সবচেয়ে বড় রুকন মনে করত। এরপর 'জিহাদের' নামে ইসলম নিষিদ্ধ খুনখারাপিতে লিপ্ত হতো। এটিই ছিল তাদের কঠিনতম ও ভয়ঙ্করতম বিভ্রান্তি।

কোনো মুসলিমকে কাফির বলা কঠিন বিভ্রান্তি। তা সন্ত্রাসের পথ উন্মুক্ত করে। ঢালাওভাবে যোদ্ধা-অযোদ্ধা সকল কাফিরকে হত্যা করা বৈধ বলে মনে করা কঠিন বিভ্রান্তি। তা সন্ত্রাসের পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপ। আর ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে জিহাদ পরিচালনা করা, কাফিরকে

---

[৩২] ইবনু তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতাওয়া ১৯/৭৩।
[৩৩] ইবনু আবিল হাদীদ, আব্দুল হামীদ (৫৮৬হি) শারহু নাহজিল বালাগাহ (কাইরো, দারু এহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৬৭) ২/২১।
[৩৪] ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৬১-৬৩।
[৩৫] Encyclopaedia Britannica, Article: Islam-Khawarij.

www.assunnahtrust.com

হত্যা করা বা শাস্তি দেওয়ার বৈধতা দাবি করা সন্ত্রাসের পথে চূড়ান্ত পদক্ষেপ।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, ইসলাম এই তিনটি পথই চূড়ান্তভাবে রোধ করেছে। মুসলিমকে কোনো কারণে কাফির বলা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বিচারের মাধ্যমে অপরাধীকে এবং যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধা পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো কাফিরকে হত্যা করা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যুদ্ধ ও বিচারকে একান্তভাবেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। যেন কেউ কখনো ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিকে কাউকে শাস্তি দিতে বা হত্যা করতে না পারে। পাশাপাশি জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রাণ, সম্পদ ও মর্যাদার ক্ষতি করাকে কঠিন হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। যেন অন্তত আখেরাতের শাস্তির ভয় মানুষকে আবেগতাড়িত হয়ে জানমালের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

এখানে প্রশ্ন, তাহলে কিভাবে ইসলামের নামে এ সকল জানবাজ আবেগী ও সৎ মানুষগুলি এ সকল কাজে লিপ্ত হলো? সম্ভবত আমরা অনুধাবন করতে পারছি যে, এর মূল কারণ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্যে লালিত সাহাবীগণ যেখানে দীন প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের গুরুত্ব স্বীকার করার পাশাপাশি রক্তপাত ও হত্যার ভয়াবহতা অনুধাবন করতেন এবং সকল উগ্রতা থেকে আত্মরক্ষা করতেন, সেখানে সঠিক জ্ঞানের অভাবের কারণে এ সকল আবেগী মানুষেরা জিহাদের নামে দ্বিধাহীন চিত্তে খুন, রক্তপাত, ধনসম্পদের ক্ষতি, বান্দার হক নষ্ট ইত্যাদি কঠিন অপরাধের মধ্যে লিপ্ত হতো।

২. ১. ৪. খারিজীদের বিভ্রান্তি অপনোদনে সাহাবীগণের প্রচেষ্টা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্য কয়েকজন সাহাবী খারিজীদের সামনে তাদের মতামদের বিভ্রান্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অনেকে এই প্রচেষ্টায় সংশোধিত হলেও অন্য অনেকেই তাদের উগ্রতা পরিত্যাগ করতে অসম্মত হয়। এর মূল কারণ ছিল, কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের পারঙ্গমতার বিষয়ে তাদের অহঙ্কার। সাহাবীগণ আজীবন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে থাকার কারণে কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা ও মতামতের বিশেষ কোনো গুরুত্ব আছে বলে খারিজীরা মানত না। আমরা দেখেছি এই মানসিকতাই ছিল সকল বিভ্রান্তির উৎস।

বস্তুত, কুরআনের বাস্তব প্রয়োগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম ও বাণীই সুন্নাত। আর সুন্নাতের আলোকেই কুরআনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ সাহাবীগণ এভাবে সুন্নাতের আলোকে খারিজীদের উন্মাদনা রোধের চেষ্টা করেছেন। প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থসমূহে সংকলিত হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ মূলত তাদের 'জিহাদ' কেন্দ্রিক বিভ্রান্তিগুলি অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখেছি যে, জিহাদ-কিতাল বিষয়ক আয়াতগুলির আলোকে খারিজীগণ জিহাদ, দীনপ্রতিষ্ঠা ও ফিতনা দূরীকরণকে দীনের রুকন বা অন্যতম ফরয বলে গণ্য করে। এভাবে তারা বিভিন্নমুখি বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়:

প্রথমত, ইবাদতের গুরুত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুন্নাতের বিরোধিতা করে। তারা যে সকল আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করে সেগুলি আদেশ, নিষেধ, পরিবর্তন, জিহাদ, দীন প্রতিষ্ঠা ও ফিতনা দূরীকরণের গুরুত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু কখনোই এই কর্মকে সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফরয বলে প্রমাণ করে না। প্রকৃত কথা যে, ইসলামে মুসলিমের উপর অনেক কর্ম ফরয করা হয়েছে। সকল ফরয কর্মই গুরত্বপূর্ণ। তবে সেগুলির মধ্যে কোনোটির চেয়ে কোনোটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। গুরুত্বের বেশিকম সাধারণভাবে সকলের জন্য হতে পারে আবার ব্যক্তিগত অবস্থার কারণে হতে পারে। সর্বাবস্থায় গুরুত্বের কমবেশি আবেগ বা যুক্তি দিয়ে নয়, বরং 'সুন্নাতের' আলোকে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজীবনের কর্ম, শিক্ষা ও আচরণের মধ্য থেকে বুঝতে হবে। সাহাবীগণ সুন্নাতের আলোকে তাদের এই ভুল অপনোদনের চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয়ত, ফারযু আইনের চেয়ে ফারযু কিফাইয়া বা নিজের চেয়ে অপরের সংশোধনের বিষয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করা। খারিজীদের কাউকে ব্যক্তিগত মত লালনে বা ব্যক্তিগত মতানুসারে ইবাদত বন্দেগী, ব্যক্তিজীবন বা পারিবারিক জীবন পালনে আলী (রা) বা অন্য কোনো সাহাবী বা পরবর্তী শাসক ও আলিমগণ বাধা দেন নি। রাষ্ট্র, শাসক বা জনগণের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বা আদেশ-নিশেষ করতেও কেউ তাদেরকে বাধা দেয় নি। তাত্ত্বিক বিতর্ক হলেও, তাদের কর্ম বাধা দেওয়া হয় নি।[৩৬] কিন্তু এতে তারা পরিতৃপ্ত থাকেনি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল 'অন্যান্যদের জীবনে 'আল্লাহর দীন' বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা করা।' এজন্য কল্পিত অপরাধে অপরাধী বা সত্যিকার অপরাধে অপরাধী শাসক, প্রশাসক ও জনগণকে সংশোধন ও ফিতনা দূর করে দীন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তারা নিজেরা পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছিল। তাদের মানসিকতা ছিল, সমাজের অন্য মানুষের জীবনে 'দীন' প্রতিষ্ঠা না হলে বোধ হয় আমার নিজের দীন পালন মূল্যহীন হয়ে গেল। সাহাবীগণ সুন্নাতের আলোকে তাদের এই বিভ্রান্তি সংশোধনের চেষ্টা করেন। এখানে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

(১) তাবিয়ী নাফি বলেন, একব্যক্তি (খারিজী নেতা নাফি' ইবনুল আযরাক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) নিকট এসে বলে

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللَّهُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلاةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ أَلا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) (قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ﷺ وَكَانَ الإِسْلامُ قَلِيلا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ حَتَّى كَثُرَ الإِسْلامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ

হে আবূ আব্দুর রাহমান, কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন? তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের সিয়াম, যাকাত প্রদান

[৩৬] তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০হি) আত-তারীখ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি) ৩/১১৪।

www.assunnahtrust.com

ও বাইতুল্লাহর হজ্জ। উক্ত ব্যক্তি বলে, হে আবূ আব্দুর রাহমান, আল্লাহ তাঁর কিতাবে কী উল্লেখ করেছেন তা কি আপনি শুনছেন না? তিনি বলেছেন: 'মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমলঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।' (তিনি আরো বলেছেন): 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'[৩৭]। তখন ইবনু উমার বলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তা করেছিলাম। ইসলাম দুর্বল ও স্বল্প ছিল, ফলে মুসলিম ব্যক্তি তার দীনের কারণে ফিতনাগ্রস্থ হতেন। কাফিররা তাকে হত্যা করত অথবা তার উপর অত্যাচার করত। যখন ইসলাম বিস্তৃত হয়ে গেল তখন তো আর ফিতনা থাকল না।"[৩৮]

এখানে ইবনু উমার (রা)-এর বক্তব্য থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি।

প্রথমত, শুধু ফযীলত, নির্দেশনা বা প্রেরণামূলক আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে কোনো ইবাদতের গুরুত্ব নির্ধারণ করা যায় না। কুরআন কারীম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামগ্রিক শিক্ষার আলোকেই তা নির্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কুরআন কারীমে সালাত, সিয়াম, যাকাত, জিহাদ, দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি অনেক ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এগুলির মধ্যে কোন্‌টি অধিকগুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি ব্যক্তিগত এবং কোনটি সামষ্টিগত, কোন্‌টি সকলের জন্য সার্বক্ষণিক পালনীয়, কোন্‌টি বিশেষ অবস্থায় পালনীয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নি। এ সকল কুরআনী নিদেশ যিনি গ্রহন করেছেন, তাঁর বাস্তব প্রয়োগ ও বাণী থেকেই এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানা যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাস্তব প্রয়োগ থেকে জানা যায় যে, কুরআনে উল্লিখিত সকল নির্দেশের মধ্যে এই পাঁচটি কর্ম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপর্ণ এবং এগুলির উপরেই দীনের ভিত্তি। জিহাদ, দাওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইবাদতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে সেগুলির পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থার আলোকে যে ছাড় বা সুযোগ আছে তা আরকানে ইসলামের ক্ষেত্রে নেই। তাঁরা বুঝতেন যে, জিহাদ আরকানে ইসলামের মত ব্যক্তিগত ফরয ইবাদত নয় যে, তা পরিত্যগ করলে গোনাহ হবে। বরং বিভিন্ন হাদীসে শুধুমাত্র আরকানে ইসলাম পালনকারীকে পূর্ণ মুসলিম ও জান্নাতী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯] অন্যান্য হাদীসে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনার সাথে সাথে জিহাদ পরিত্যাগকারী আরকান পালনকারী মুমিনেরও প্রশংসা করা হয়েছে।[৪০]। অনেক হাদীসে বিশৃঙ্খলা, ফিতনা বা হানাহানির সময়ে, আদেশ, নিষেধ, দাওয়াত ও জিহাদ পরিত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।[৪১] অন্যত্র পিতামাতার খেদমত বা আনুসঙ্গিক প্রয়োজনের জন্য জিহাদ পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৪২]

বস্তুত, রাষ্ট্র, সমাজ ও অন্য মানুষের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠাকে নিজের ব্যক্তি জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার মত একই পর্যায়ের ইবাদত বলে মনে করা, অথবা তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা উগ্রতা ও সন্ত্রাসের কারণ। এই উগ্রতা বিভিন্ন বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে, যেমন, অন্যান্য মুমিনের বা রাষ্ট্রের পাপ অন্যায় দূর করতে ব্যর্থ হয়ে তাদেরকে কাফির বলা, সমাজের মানুষদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করা, জোর করে মানুষদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করা, নিজের জীবনে ইবাদত বা তাহাজ্জুদ, যিক্‌র, ক্রন্দন ইত্যাদিতে অবহেলা করা।

ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে নিয়ে ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। তবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে ইসলামে। রাষ্ট্র ব্যবস্থাসহ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া সকল দেশের সকল সমাজের মানুষদের জন্য পালনীয় প্রশস্ততা রয়েছে ইসলামে। মুসলিম-অমুসলিম সকল দেশ ও সমাজে বসবাস করে একজন মুসলিম তার ধর্ম পালন করতে পারেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তার ধর্ম পালনের জন্য শর্ত বা মূল স্তম্ভ বলে গণ্য করা হয় নি। রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামের একটি অংশ। ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান আছে। তবে ইসলাম শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম নয়। মুমিন আরকানে ইসলাম সহ অন্যান্য ফরয, নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে নিজের জীবনে পূর্ণতমভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র যে কোনো ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হলে সুযোগ ও সাধ্যমত কুরআন নির্দেশিত উত্তম আচরণ দ্বারা খারাপ আচরণের প্রতিরোধ পদ্ধতিতে দাওয়াত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে তা সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। তবে এই চেষ্টা সফল না হলে মুমিনের দ্বীন-পালন ব্যাহত হয় বা সমাজ ও রাষ্ট্রের পাপের কারণে ব্যক্তি মুমিন পাপী হন এরূপ চিন্তা বিভ্রান্তিকর। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন,

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

"হে মুমিনগণ, তোমাদের উপরে শুধু তোমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।"[৪৩]

কাজেই পরিবর্তনের আগ্রহে কোনো মানুষের জান, মাল, সম্মান ইত্যাদির ক্ষতি করা বা অন্য কোনো ইসলাম নিষিদ্ধ পাপের মধ্যে নিপতিত হওয়া চরম বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়।

---

[৩৭] সূরা বাকারা, ১৯৩ আয়াত।

[৩৮] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০।

[৩৯] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৫, ২৭, ২/৫০৬, ৯৫১, ৪/১৭৯৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯-৪৪।

[৪০] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫০৩।

[৪১] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৩১৫; ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ আল-বুসতি (৩৫৪হি), আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩) ২/১০৮; তিরমিযী ৫/২৫৭; আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর) ৪/১২৪; দানী, আবূ আমর উসমান ইবনু সাঈদ (৪৪৪ হি), আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান (রিয়াদ, দারুল আসিমা, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৬ হি) ২/৩৬৩-৩৭০; মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আব্দুল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কুতুবলি ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি) ৩/২৯৫-২৯৯; ইবনু রাজাব, আব্দুর রাহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫ হি.), জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮হি), পৃ. ৩২৩-২৩৪।

[৪২] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৯৪, ৫/২২২৮, মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৫; মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/২১৫-২১৮।

[৪৩] সূরা ৬: মায়িদা, আয়াত ১০৫।

ইবনু উমার নিজেও কাফির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। তবে জিহাদের অনেক শর্ত রয়েছে, সেগুলির অন্যতম যে, জিহাদ শুধু যুদ্ধরত কাফিরের বিরুদ্ধেই হবে। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মুসলিম বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যদিও বৈধ করা হয়েছে, কিন্তু ইবনু উমার (রা) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবী এক্ষেত্রে দূরে থাকাই পছন্দ করতেন, কারণ ভুল জিহাদে কোনো মুসলিমকে হত্যা করার চেয়ে, সঠিক জিহাদ থেকে বিরত থাকা উত্তম।

তৃতীয়ত, তাঁরা ফিতনা দূরীকরণ ও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মুসলিমের দীন পালনের নিরাপত্তাটিই মূল বলে মনে করেছেন। মুসলিম যতক্ষণ দীন পালনের নিরাপত্তা ভোগ করছেন ততক্ষণ ফিতনা দূরীভূত করার নামে যুদ্ধ করার সুযোগ নেই। বরং দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

(২) যে সকল সাহাবী খারিজীদের বুঝাতে চেষ্টা করেন তাঁদের একজন জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ (৬০ হি)। একবার তিনি 'কুররা' বা সদাসর্বদা কুরআন তিলাওয়াত ও চর্চায় লিপ্ত এ সকল খারিজীদের কতিপয় নেতাকে ডেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

من شاق شق الله عليه يوم القيامة... ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه (كانما يذبح دجاجة كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه) فليفعل

"যে ব্যক্তি কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন করবে আল্লাহও তার জন্য কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন করবেন। কেউ যদি কোনো মানুষের হাতের তালুতে রাখার মত সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে (যেন যে মুরগী জবাই করছে) তবে সেই রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে (সে জান্নাত দেখতে পাবে, কিন্তু সেই রক্ত তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিবে না)। কাজেই যদি কেউ পারে এইরূপ রক্তপাত থেকে আত্মরক্ষা করতে, তবে সে যেন আত্মরক্ষা করে।"

এ কথা শুনে উপস্থিত লোকগুলি খুব ক্রন্দন করতে লাগল। তখন জুনদুব (রা) বলেন, এরা যদি সত্যবাদী হয় তবে এরা মুক্তি পেয়ে যাবে।.. কিন্তু পরে আবার তারা উগ্রতার পথে ফিরে যায়।[৪৪]

এখানে জুনদুব (রা) দুটি বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

প্রথমত, উগ্রতার ভয়াবহতা। উগ্রতার দুটি দিক রয়েছে। প্রথম দিক, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে দীন পালনের জন্য নফল-মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ে অতি কষ্টদায়ক রীতি অনুসরণ করা। দ্বিতীয় দিক, অন্য মানুষদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনকে নিজের অন্যতম বোঝা বলে গ্রহণ করা এবং সেজন্য উগ্রতার পথ অবলম্বন করা। দুটি বিষয়ই সুন্নাতের পরিপন্থী কর্ম যা মুমিনের জীবনে দীন পালনকে কঠিন করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, তিনি সুন্নাতের আলোকে জিহাদ বনাম হত্যার ভয়াবহতা তুলে ধরছেন এবং জিহাদের নামে হত্যা বা রক্তপাতের ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সালাত, সিয়াম, যিক্‌র ইত্যাদি ইবাদতের মত ইবাদত নয় জিহাদ। এ সকল ইবাদত যদি কোনো কারণে ভুল হয় তবে তাতে ইবাদতকারী কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হয় না। পক্ষান্তরে জিহাদ বিচারের মত বান্দার হক জড়িত ইবাদত। ইসলামের মূলনীতি এই যে, বিচারকের ভুলে নিরপরাধীর সাজা হওয়ার চেয়ে অপরাধীর বেঁচে যাওয়া বা সাজা কম হওয়া ভাল।[৪৫]

অনুরূপভাবে জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করার চেয়ে জিহাদ না করা অনেক ভাল। জিহাদের নামে ভুল মানুষকে হত্যা করলে শত পুন্য করেও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। পক্ষান্তরে সাধারণভাবে আজীবন জিহাদ না করলেও এইরূপ শাস্তিলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। বিশেষত জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা সত্ত্বেও জিহাদের শর্ত না পাওয়ার কারণে জিহাদ বর্জন করলে কোনোরূপ গোনাহ হবে বলে কুরআন বা হাদীসে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি।

এখানে লক্ষণীয় যে, জ্ঞান ও অনুভূতি আসার পরেও তারা উগ্রতা পরিত্যাগ করতে পারল না। এর কারণ সম্ভবত এদের মধ্যে সকলেই সৎ ও আন্তরিক ছিল না। এ সকল সন্ত্রাসী কর্মের মাধ্যমে নেতৃত্ব, ক্ষমতা, সম্পদ ও অন্যান্য জাগতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যও অনেকের ছিল। অথবা উগ্রতার উন্মাদনা ও সঙ্গীসাথীদের অপপ্রচার তাদেরকে আবারো বিপথগামী করে।

(৩) ৬০ হিজরীতে মু'আবিয়ার (রা) মৃত্যুর পরে তার পুত্র ইয়াযিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে তাকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করলেও মক্কা, মদীনা ও কুফার অধিকাংশ মানুষ তার খিলাফতের বিরুদ্ধে ছিলেন। মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ইয়াযিদের খিলাফত অস্বীকার করেন এবং এক পর্যায়ে নিজে খিলাফতের দাবি করেন। ৬৪ হিজরীতে ইয়াযিদের মৃত্যুর পরে ইবনু যুবাইর মক্কায় খলীফা হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন। অপরদিকে সিরিয়ায় ইয়াযিদের পুত্র মু'আবিয়াকে খলীফা ঘোষণা করা হয়। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা ইবনু যুবাইরকেই খলীফা হিসেবে গ্রহণ করে। একপর্যায়ে ৭৩ হিজরীতে উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিকের সেনাবাহিনীর হাতে ইবনু যুবাইর পরাজিত ও নিহত হন।

এই দীর্ঘ প্রায় ১০ বৎসরের সংঘাতের সময়ে অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মুসলিম ইবনু যুবাইরের শাসনকেই ইসলামী শাসন ও ন্যায়বিচারের পক্ষে মনে করেছেন। ইয়াযিদ ও তার বংশকে তারা ইসলামী শাসনের বিরোধী বলে গণ্য করেছেন। তবে তৎকালিন জীবিত সাহাবীগণ সরাসরি সংঘাতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন। কারণ যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছেন তাকে প্রাণ, সম্পদ বা মর্যাদার কোনোরূপ ক্ষতি করা ইসলামে কঠিনভাবে হারাম করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, তারা মনে করতেন, যারা সংঘাতে লিপ্ত তারা তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মের আলোকে ভাল বা মন্দ বলে গণ্য হবেন। তবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে রাজনৈতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়া জরুরী নয়। কিন্তু হারাম থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। পক্ষান্তরে খারিজীগণ এবং তাদের মত আবেগীগণ মনে করত, এই সংঘাতের মধ্যেই 'ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে কাজেই 'ইসলাম

[৪৪] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬১৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১৩/১২৯-১৩০।

[৪৫] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৪২৬; শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫ হি.) নাইলুল আউতার, (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩) ৭/২৭১-২৭২; আল-আমিদী, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৬৩১ হি), আল-ইহকাম (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম মুদ্রণ, ১৪০৪) ২/১৩০, ৪/৬৫।

www.assunnahtrust.com

প্রতিষ্ঠার' এই মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কিছু মানুষ হত্যা করা কোনো ব্যাপার নয়। বিশেষত যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করতে অসুবিধা কী? ৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ যখন মক্কা অবরোধ করে ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমন চালাতে থাকে, তখন দুই ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর নিকট এসে বলে,

إِنَّ النَّاسَ ضُيِّعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي فَقَالا أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ

মানুষেরা ফিতনা-ফাসাদে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী, আপনি কেন বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন না? তিনি বলেন, কারণ আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন। তারা বলে, আল্লাহ কি বলেন নি, 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'? তখন তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম এবং ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করবে যেন ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হয়।"[৪৬]

এখানে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) **প্রথমত,** জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করছেন। ইসলামের মূলনীতি আদেশ পালনের চেয়ে নিষেধ বর্জন অগ্রগণ্য।[৪৭] বিশেষত এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কর্মটি কুরআন-হাদীসে বারংবার ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে জিহাদের বারংবার আদেশ করা হলেও তার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে ফরয আইন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি এবং তা পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি কর্ম পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, তিনি 'জিহাদ-কিতাল' ও 'ফিতনা' বা সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সাহাবীগণ যে কিতাল করেছিলেন তা ছিল ফিতনা রোধ করতে, আর খারিজীগণ যে কিতাল করছে তা ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ উল্লেখ করেন নি। আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখতে পাব যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও ফিতনা বা সন্ত্রাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য যে, জিহাদ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ এবং ফিতনা-সন্ত্রাস ব্যক্তি বা গোষ্ঠি পরিচালিত যুদ্ধ। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে ও নেতৃত্বেই জিহাদ-কিতাল পরিচালিত হবে। খারিজীগণ বিষয়টিকে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত পর্যায়ে নিয়ে এসে সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। বস্তুত, হত্যা, বিচার, শক্তিপ্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় যদি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে তা ফিতনার মহাদ্বার উন্মোচন করে। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই অন্য কোনো না কোনো মানুষের দৃষ্টিতে অন্যায়কারী ও অপরাধী। প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যদি নিজের মতমত বিচার, যুদ্ধ ও শক্তিপ্রয়োগ করতে থাকে তবে তার চেয়ে বড় ফিতনা আর কিছুই হতে পারে না।

(৪) তাবিয়ী সাফওয়ান ইবনু মুহরিয বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের ফিতনার সময়ে সাহাবী জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী (রা) এ সকল সংঘাতের বিষয়ে আগ্রহী কতিপয় ব্যক্তিকে ডেকে একত্রিত করে তাদেরকে সর্বাবস্থায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠকারী ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার পরিণতি থেকে সাবধান করার জন্য বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধের মাঠে একজন কাফির সৈনিক দুর্দমনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং মুসলিম বাহিনীর অনেক সৈনিককে হত্যা করে। এক পর্যায়ে উসামা ইবনু যাইদ (রা) উক্ত কাফির সৈনিককে আক্রমন করেন। তিনি যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন তখন উক্ত কাফির সৈনিক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। উসামা সেই অবস্থাতেই তাকে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উসামাকে বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পরেও তুমি তাকে কেন হত্যা করলে? তিনি বলেন, লোকটি মুসলিম বাহিনীকে অনেক কষ্ট দিয়েছে অমুক, অমুককে হত্যা করেছে, আমি যখন তরবারী উঠালাম সে তরবারীর ভয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি তার হৃদয় চিরে দেখে নিলে না কেন, সে ভয়ে বলেছে না সেচ্ছায় বলেছে! কেয়ামতের দিন যখন এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে? কেয়ামতের দিন যখন এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে? এভাবে তিনি বারবারই বলতে লাগলেন, কেয়ামতের দিন যখন এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে?[৪৮]

এভাবে জুনদুব (রা) ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা ও তাকে হত্যা করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে এদেরকে সাবধান করছেন।

(৫) উসামা বিন যাইদ (রা) স্বয়ং এই ঘটনা বর্ণনা করে এইরূপ আবেগী যুবকদের বুঝাতে চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন,

حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ وَأَنَا وَاللَّهِ لا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এভাবে বারংবার ব্যাকুল চিত্তে আফসোস করলে লাগলেন, তখন আমি কামনা করতে লাগলাম যে, হায় যদি আমি আগে ইসলাম গ্রহণ না করে আজই নতুন মুসলমান হতাম তাহলে কতই না ভাল হত! তখন হযরত সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, উসামা যতক্ষণ কোনো মুসলিমকে হত্যা না করবে আমি কখনো কোনো মুসলিমকে হত্যা করব না। তখন উপস্থিত একজন বলল, কেন আল্লাহ বলেন নি, 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'। তখন সা'দ বলেন, আমরা তো যুদ্ধ করেছিলাম ফিতনা দূরীভূত করতে, আর তুমি এবং তোমার সাথীরা যুদ্ধ করতে চাও ফিতনা সৃষ্টি করতে।[৪৯]

২. ২. বাতিনী সম্প্রদায়

২. ২. ১. উৎপত্তি ও ইতিহাস

[৪৬] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০।
[৪৭] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৫৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৩০।
[৪৮] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯৬-৯৭; নাবাবী, শারহু সাহীহি মুসলিম ২/১০১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১২/১৯৬, ২০১।
[৪৯] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯৬-৯৭; নাবাবী, শারহু সাহীহি মুসলিম ২/৯৯-১০৪।

www.assunnahtrust.com

শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি 'বাতিনী' সম্প্রদায়। শিয়াগণ ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা 'ইমামত' বংশতান্ত্রিক বলে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয়বিধ নেতৃত্ব আলী (রা)-এর প্রাপ্য ছিল। এরপর তা তাঁর বংশধরদের মধ্যেই থাকবে। এই নেতৃত্ব বা ইমামতকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে অনেক দল উপদল সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশ শিয়া বিশ্বাস করেন যে, আলী বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জা'ফার সাদিকের (১৪৮ হি) পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মূসা কাযিম (১৮৩ হি) ইমামতি লাভ করেন। একটি উপদল মনে করে যে, জা'ফার সাদিকের জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাঈল (১৪৮ হি) ছিলেন প্রকৃত ইমাম। তাঁর পরে এই ইমামত তাঁর সন্তানদের মধ্যে থাকে। এদেরকে ইসমাঈলিয়া বাতিনীয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

'বাতিনীয়া' সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর 'বাতিনী' বা গোপন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে কুরআনের বা ইসলামের নির্দেশাবলীর দুইটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক বা যাহিরী অর্থ। এই অর্থ সকলেই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ। এই অর্থ শুধু আলী বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধিগণ জানেন। আর এই গোপন অর্থই 'হাকীকত' বা ইসলামের মূল নির্দেশনা। শুধু সাধারণ জাহিলগণই প্রকাশ্য নির্দেশ নিয়ে পড়ে থাকে। আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থ বুঝে সেমতই তাদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন। মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাঁদের অনুসারীগণ তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে মেনে নিতেন। আবার তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সকল ব্যাখ্যার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপদল গড়ে উঠত।

তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ 'কারামিতা', ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা যেহেতু ইসলামের নির্দেশনাগুলিকে নিজেদের মতমত ব্যাখ্যা করত সেহেতু এরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত। এ সকল সন্ত্রাসীদের অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিযারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। যারা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে।

হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী নিজেকে ইসমাঈলীয়া ফাতিমীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুসতানসির বিল্লাহ (৪৮৭ হি)-এর জৈষ্ঠ্য পুত্র নিযার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুক্কায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল জানবায ফিদায়ী তৈরি করেন। যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত। এদের মাধ্যমে তিনি উত্তর পারস্যে আলবুর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যাকায় 'আল-মাওত' নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে তথায় তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি তার ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকেন। তার প্রচারিত 'ধর্মীয়-রাজনৈতিক' আর্দশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকেই তিনি শত্রু মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাও গুপ্তহত্যা এভাবে আর কোনো দল করে নি। এসকল দুর্ধর্ষ আত্মঘাতী ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ উযির নিযামুল মুলক, প্রসিদ্ধ আলিম নজুমুদ্দীন কুবরা সহ অনেক মুসলিম নিহত হন। পার্শবর্তী এলাকা ও দেশগুলিতে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ কেউই বুঝতে পারতেন না যে, এসকল ফিদাঈদের পরবর্তী টার্গেট কে। হাসানের পরে তার বংশধরেরা আল-মাওত দূর্গ থেকে ফিদাঈদের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তৎকালীন মুসলিম সরকারগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃ) হালাকু খার বাহিনী এদের নির্মূল করে।[৫০]

২. ২. ২. তুলনামূলক পর্যালোচনা

ইসলামের ইতিহাসের এই প্রাচীন দুটি সংগঠনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে মৌলিক তিনটি পার্থক্য আমরা দেখতে পাই:

প্রথমত, আমরা দেখতে পেয়েছি যে, খারিজীগণ মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করত। যুদ্ধ ছাড়াও তারা মুসলিম জনবসতির উপর আক্রমন করত এবং অযোদ্ধা পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করত ও লুটপাট করত। তবে সাধারণত তারা গুপ্ত হত্যার আশ্রয় গ্রহণ করত না। তাদের দৃষ্টিতে ইসলামের শত্রুবাহিনীর প্রধান হিসেবে আলী (রা), মুআবিয়া (রা) এবং আমর ইবনুল আসকে (রা) গুপ্তহত্যা করার পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করে এবং আলীর (রা) ক্ষেত্রে তারা সফল হয়। তবে অযোদ্ধা মানুষদের কখনো গুপ্ত হত্যা করেছে বলে আমরা জানতে পারি না। পক্ষান্তরে বাতিনী সম্প্রদায়ের মূল পদ্ধতিই ছিল গুপ্ত হত্যা। এ কারণেই বাতিনীদের কর্মকাণ্ড সমাজে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। খারিজীদের আক্রমন থেকে পালিয়ে বাঁচার কিছু সম্ভাবনা থাকলেও বাতিনীদের গুপ্ত হত্যা থেকে আত্মরক্ষার কোনো পথ মানুষ খুঁজে পেত না।

দ্বিতীয়ত, খারিজীগণ ইসলামের বাহ্যিক ও পরিপূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে আপোসহীন ছিল। বিজয় লাভের জন্য ইসলামে নিষিদ্ধ কোনো কর্ম তারা করত না। এজন্য তাদের মধ্যে আত্মহত্যা, আত্মঘাতী হামলা ইত্যাদির কোনো ঘটনা আমরা দেখতে পাই না। আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম আলীকে (রা) হত্যা করে ধরা দিয়েছে, কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা করেনি। কারণ নিজের হাতে নিজের জীবন নষ্ট করা আত্মহত্যা ও কঠিন পাপ বলে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আর শত্রুর হাতে শহীদ হওয়াকে শাহাদত ও জান্নাতের কারণ। পক্ষান্তরে বাতিনী ফিদাঈগণ যে কোনোভাবে ইমামের নির্দেশমত জীবন দান করাকেই জান্নাতের পথ বলে বিশ্বাস করত, আত্মহত্যা বা অপরের হাতে হত্যার মধ্যে তারা পার্থক্য করত না।

[৫০] আহমদ মুহাম্মাদ জলী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক,পৃ. ২৬৫-৩০৬; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৯৮।

www.assunnahtrust.com

তৃতীয়ত, খারিজীগণ কখনোই নিজেদের আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনীয়তা বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করত না। তারা নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মের কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রচার করত। পক্ষান্তরে বাতিনী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিই ছিল গোপনীয়তা ও মিথ্যা। তারা সর্বদা নিজেদের মতবাদ গোপন রেখে সমাজের মানুষদের সাথে মত, বিশ্বাস ও কর্মে একাত্মতা প্রকাশ করত। শুধু বাছাই করা মানুষদের কাছে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে দাওয়াত দিত।[৫১]

৩. ইসলামের নামে সন্ত্রাসের কারণ ও বিভ্রান্তির স্বরূপ

ইসলামের ইতিহাসের এই দুই জঙ্গিবাদী সংগঠনের আবির্ভাব ও প্রসারের কারণ হিসেবে আমরা নিম্নের বিষয় দুটি চিহ্নিত করতে পারি:

(১) কিছু মানুষের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস। বাতিনী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে আমরা সুনিশ্চিতভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, কতিপয় উচ্চাভিলাসী অসৎ ব্যক্তি ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইসলামের নামে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। খারিজীদের ক্ষেত্রেও একথা প্রতীয়মান হয় যে, এদের মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উচ্চাভিলাসের জন্য সঠিক বিষয় উপলব্ধি করার পরেও উগ্রতার পথ পরিহার করে নি। বিষয়টি এদের কতিপয় নেতার ক্ষেত্রে স্পষ্ট। অন্যান্যরা এদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে।

(২) ইসলাম সম্পর্কে ভুল শিক্ষা লাভ করা। খারিজীগণ কুরআনকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করলেও, কুরআনের নির্দেশ বুঝার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাস্তব কর্মজীবন ও সাহাবীগণের বুঝ ও মতামতের গুরুত্ব না দিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বাতিনীগণ ইসলামের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ অধিকার ও পবিত্রতায় বিশ্বাস করে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে।

ইসলামের নামে বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড রোধ করতে সন্ত্রাসীদের বিভ্রান্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ যে কোনো যুগে ও সমাজে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রচার করতে এই একই বিভ্রান্তির উপর নির্ভর করা হয়। ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাস উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই হোক, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই হোক, অথবা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আবেগ ও উন্মাদনার কারণেই হোক, ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য খারিজী ও বাতিনীদের বিভ্রান্তিকর মতগুলি নিত্যনতুন পোষাকে উপস্থাপন করার ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। এজন্য আমরা এখানে সংক্ষেপে হলেও এদের মতামতগুলি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা করতে চাই।

৩. ১. জ্ঞান ও ধার্মিকতার অহঙ্কার

নিঃসন্দেহে কুরআন ও হাদীস ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস এবং প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব নিজে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সকল মুসলিম কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করবেন, কিন্তু সকল মুসলিমই বিশেষজ্ঞ হবেন না। প্রত্যেক মুমিন নিজ জীবনের পাথেয় হিসেবে কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু উম্মাহর সমস্যায় সমাধান দেওয়ার জন্য অবশ্যই ইসলামী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। মহান আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করে তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বর্ণনার দায়িত্ব প্রদান করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। তাঁর এ সকল ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করেছেন সাহাবীগণ। কুরআন কারীমে সাহাবীগণকে এ জন্য বিশেষ মর্যাদায় ভুষিত করা হয়েছে।[৫২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীগণ ছাড়া পরবর্তী দুই প্রজন্মকেও সামগ্রিকভাবে বিশেষ মর্যাদায় ভুষিত করেছেন।[৫৩]

কুরআনের পরিপূর্ণ অধ্যয়ন, বিশাল হাদীস ভাণ্ডারের সকল হাদীস অধ্যয়ন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহচর-সাহাবীগণের কর্ম, চিন্তা, মতামত ও কুরআন-হাদীস ব্যাখ্যার প্রক্রিয়া অধ্যয়ন ও সমস্যা সমাধানে সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মতামত ও কর্মধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভের পরেই একজন মানুষ প্রকৃত আলিম ও ফকীহ বলে গণ্য হন এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রিয় সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামী 'ফাতওয়া' বা সিদ্ধান্ত ও সমাধান দানের যোগ্যতা অর্জন করেন। স্বভাবতই এরূপ আলিমদের সংখ্যা সমাজে কম থাকে। এজন্য মুসলিম উম্মাহর আলিমগণের রীতি এই যে, জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে সমকালীন প্রাজ্ঞ আলিমগণের মতামত গ্রহণের পাশাপাশি পূর্ববর্তী প্রখ্যাত আলিম, ফকীহ ও ইমামদের মতামতের অনুসন্ধান ও তাদের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান। এক্ষেত্রে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা আলোকে সাহাবীগণ ও তাঁদের পরবর্তী দুই প্রজন্মের আলিমদের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

এই মূলনীতি লঙ্ঘন করার কারণেই ইসলামের ইতিহাসের প্রাচীন দুই সন্ত্রাসী সম্প্রদায় জন্মলাভ করেছে। খারিজীগণ সাহাবীগণের এবং তাঁদের পরে সমাজের মূলধারার আলিমগণের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। নিজেদের মতামতকেই তারা চূড়ান্ত বলে মনে করেছে। তবে তারা এরূপ মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতা, অধিকার বা আল্লাহর সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক, কাশফ, ইলহাম, গোপন জ্ঞান ইত্যাদির কোনো দাবি করে নি। স্বাভাবিক মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেক মুসলিমই কুরআন বুঝতে পারে এবং তার বুঝই চূড়ান্ত বলে তারা দাবি করেছে। পক্ষান্তরে বাতিনীগণ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ গোপন জ্ঞান, কাশফ, ইলহাম, ইলকা, আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক বা বিশেষ 'পদাধিকার' দাবি করেছে। ফলে এ সকল কল্পিত নেতা বা নেতাদের নামে অন্য কেউ তাদের কঠিন বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত করেছে। উভয় পদ্ধতিতেই মুসলিমের মধ্যে ধার্মিকতা, ধর্মপালন ও ধর্মজ্ঞান সম্পর্কে অপ্রতিরোধ্য 'অহঙ্কার' সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে সে ইসলাম সম্পর্কে তার বা তার নেতৃবৃন্দের ব্যাখ্যা বা মতকেই চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করে বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

৩. ২. মুসলিমকে কাফির বলা

কাউকে হত্যা করতে হলে তাকে 'কাফির' ও ইসলামের শত্রু প্রমাণ করা খুবই জরুরী। নইলে মুসলিম মানস সহজে এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ বা সমর্থন মেনে নেবে না। এজন্য প্রকৃত বা কল্পিত পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির বলা সন্ত্রাসের পথে অন্যতম পদক্ষেপ। খারিজী ও বাতিনী সকল

---

[৫১] ড.আহমদ, দিরাসাতুন আলি ফিরাক, পৃ.২৬৫-৩০৬; ড. নাসির, আল-খাওয়ারিজ, পৃ. ২০।

[৫২] দেখুন: সূরা আল-ইমরান: ১০১, ১১০, ১৭২-১৭৪, সূরা আনফাল: ৬২, ৭২, ৭৪, সূরা তাওবা: ৮৮-৮৯, ১০০, ১১৭, সূরা ফাতহ: ১৮-১৯, ২৬, ২৯, সূরা হুজুরাত:৭, সূরা হাদীদ ১০, সূরা হাশর: ৮-১০ আয়াত।

[৫৩] বুখারী, আস-সহীহ ২/৯৩৮, ৩/১৩৩৫, ৫/২৩৬২, ৬/২৪৫২, ২৪৬৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৬২-১৯৬৫।

www.assunnahtrust.com

সন্ত্রাসীই এই পথ অবলম্বন করেছে। তাদের মতের স্বপক্ষে তারা কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছে। কিন্তু এ সকল উদ্ধৃতির অর্থ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'সুন্নাত' ও সাহাবীদের মত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এভাবে তারা প্রকৃত পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির বলেছে, রাজনৈতিক কারণে মুসলিমকে কাফির বলেছে এবং সমর্থন বা আনুগত্যের অভিযোগে সকল মুসলিমকে কাফির বলেছে।

৩. ২. ১. পাপের কারণে মুসলিমকে কাফির বলা:

ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণ সততা ও পাপমুক্ত জীবন যাপনে উৎসাহ দিয়েছে, কিন্তু মুসলিম বলে গণ্য হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ পাপমুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করেনি। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর বিধান অনুসারে ফয়সালা না করাকে কুরআনে কুফরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কুরআন ও হাদীসে অনেক পাপকে কুফরী বলা হয়েছে। এগুলির উপর নির্ভর করে খারিজীগণ দাবি করে যে, আল্লাহর বিধান অমান্য করে যে কোনো পাপে লিপ্ত হওয়ার অর্থই আল্লাহর বিধানের বাইরে ফয়সালা দেওয়া। কাজেই সকল পাপীই কাফির।

তাদের এই মত কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয়। কুরআন ও হাদীসে যেমন বিভিন্ন পাপকে 'কুফরী' বলা হয়েছে, তেমনি কঠিন পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকেও মুমিন বলা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা ফয়সালা না করে তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। আর আল্লাহর অন্যতম বিধান, এক মুমিন অন্য মুমিনকে হত্যা করবে না, বা পরস্পরে যুদ্ধ করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টতই মুমিনের সাথে যুদ্ধ করাকে 'কুফরী' বলেছেন। তিনি বলেন, **سباب المسلم فسوق وقتاله كفر**

"মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।"[৫৪]

অথচ আমরা দেখছি যে, আল্লাহর এই বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা দিয়ে মুমিনের সাথে যুদ্ধরত ব্যক্তি, হাদীসের ভাষায় যে স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত, তাকে কুরআন কারীমে 'মুমিন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত আয়াতে পরস্পরে যুদ্ধরত মানুষদেরকে মুমিন বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং পরের আয়াতে যুদ্ধরত মুমিনদেরকে অন্য মুমিনদের ভাই বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অগণিত হাদীসে পাপীদেরকে মুমিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচার্যে লালিত সাহাবীগণ বলতেন যে, কুরআন কারীমে ব্যবহৃত কুফর, নিফাক ও জুলম দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: কখনো তা অবিশ্বাস, ঈমানের অনুপস্থিতি ও চূড়ান্ত অন্যায় অর্থে এবং কখনো তা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পাপ, মুনাফিকের গুণ ও সাধারণ পাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা সন্ত্রাস ও অশান্তির প্রথম পদক্ষেপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে তার উম্মাতকে সতর্ক করেছেন ও কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করতে শিক্ষা দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه

"যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা দু জনের একজনরে উপর প্রযোজ্য হবে। যদি তার ভাই সত্যিই কাফির হয় তবে ভাল, নইলে যে তাকে কাফির বলল তার উপরেই কুফরী প্রযোজ্য হবে।"[৫৫]

সাবিত ইবনু দাহহাক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله

"যদি কেউ কোনো মুমিনকে কুফরীতে অভিযুক্ত করে তবে তা তাকে হত্যা করার মতই অপরাধ হবে।"[৫৬]

এই অর্থে আরে ৮/১০ জন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।এ থেকে বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়শঃই তাঁর সাহাবীগণকে সতর্ক করতেন।

কুরআন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে এবং কুরআন-হাদীসের সকল বক্তব্যের সামগ্রিক ও সমন্বিত অর্থের উপর নির্ভর করে সাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারী পরবর্তী সকল যুগে মুসলিম উম্মাহর মূলধারার মুসলিমগণ ঈমানের দাবিদার কাউকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাদের মুলনীতি এই যে, মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। সকল কুফর, শিরক, পাপ, অন্যায়, অবাধ্যতা ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী চিন্তাচেতনা থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি গ্রহণ করার বিষয়ে বাহ্যিক দাবির উপর নির্ভর করবেন। কোনো ঈমানের দাবিদারকেই কাফির না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ভুল করে কোনো মু'মিনকে কাফির মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো কাফির, মুশরিক বা মুনাফিককে মুসলিম মনে করা অনেক ভাল ও নিরাপদ। প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এই নীতির ভিত্তিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছেন, তাকে কোনো পাপের কারণে 'অমুসলিম', কাফির বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না, তিনি তার পাপ থেকে তাওবা করুন, অথবা নাই করুন, যতক্ষণ না তিনি সুস্পষ্টভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো বিশ্বাস পোষণ করার ঘোষণা দিবেন। ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী, বা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম পাপী মুসলিম বলে গণ্য হবেন। কখনোই তাকে পাপের কারণে 'অমুসলিম' বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা হবে না। তবে যদি তার এই পাপ বা অবাধ্যতাকে তিনি বৈধ মনে করেন বা ইসলামী বিধানকে বাজে, ফালতু, অচল বা অপালনযোগ্য বলে মনে করেন, বা ইসলামের কিছু বিধান পরিত্যাগ করেও ভাল মুসলিম হওয়া যায় বলে মনে করেন তবে তা কুফরী বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে।

ঈমানের দাবিদার জেনে শুনে কুফরী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে। কারো কথা বা কর্ম যদি বাহ্যত কুফরী হলেও তার কোনোরূপ

---

[৫৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭, ৫/২২৪৭, ৬/২৫৯২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৮১।
[৫৫] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৬৩-২২৬৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭৯।
[৫৬] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৪৭, ২২৬৪।

www.assunnahtrust.com

ইসলাম সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তবে দূরবর্তী হলেও ইসলামী ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাকে মুমিন বলে মেনে নিতে হবে। সর্বোপরি ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট কোনো কুফরী বা শিরকী কাজে লিপ্ত হয়, তবে তার কর্মকে কুফরী বলা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাকে কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোনো ওযর আছে কিনা তা জানতে হবে। সেই ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয় বা অন্য কোনো ওজরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা মূলধারার মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিতে এ ইসলামের অন্যতম মূলনীতি।[৫৭]

এই মূলনীতির প্রতি সাহাবীগণের বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, তাঁরা কখনো খারিজীদেরকে কাফির বলেন নি। খারিজীগণ তাঁদেরকে কাফির বলেছে, নির্বিচারে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের সাথে যুদ্ধ করতে ও এদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, কিন্তু কখনো আলী (রা) বা অন্য কোনো সাহাবী তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন নি। বরং তাঁরা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন এমনকি এদের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের কাঠগড়ায় ছাড়া কখনোই এদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেন নি।[৫৮]

৩. ২. ২. রাজনৈতিক কারণে কাফির বলা:

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, খারিজী ও বাতিনীগণের কাফির কথনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। কুরআন-হাদীস নির্দেশিত সুস্পষ্ট পাপে লিপ্ত তাদের দলভুক্ত ব্যক্তিদেরকে অনেক সময় তারা মুমিন বলে গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক বিরোধীদেরকে কল্পিত পাপ বা 'আল্লাহর আইন অমান্য' করার অপরাধে কাফির বলে গণ্য করেছে। আমরা দেখেছি যে, আলী (রা) ও তাঁর অনুসারীদেরকে তারা কল্পিত পাপের অপরাধে কাফির বলে। এছাড়া উমার ইবনু আব্দুল আযীয ছাড়া অন্যান্য উমাইয়া শাসককেও তারা কাফির বলে গণ্য করে। কারণ তারা শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের পরামর্শ বা শূরা গ্রহণের বিষয়ে আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে এর বিপরীতে বংশতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, ন্যায়বিচার, সাম্য ইত্যাদি বিষয়ক আল্লাহর বিধানাদি পরিত্যাগ করে মানুষের মনগড়া নিয়মনীতি প্রবর্তন করেন। উমার ইবনু আব্দুল আযীযকে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকারী, সৎ ও ন্যায়বিচারক হিসেবে মানলেও, তিনি যেহেতু পূর্ববর্তী শাসকদেরকে কাফির বলতে অস্বীকার করেন, সেহেতু তারা তাঁর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ অব্যাহত রাখে।[৫৯]

এক্ষেত্রে সাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারী তাবিয়ী ও পরবর্তী আলিমগণ পূর্ববর্তী মূলনীতির অনুসরণ করেন। তাঁরা বলেন, কুরআন কারীমে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান মত ফয়সালা না করাকে কুফরী বলা হলেও অন্যত্র আল্লাহর বিধানের বিপরীত ফয়সালাকারীকে মুমিন বলা হয়েছে। কাজেই যদি কোনো ব্যক্তি ইসলামী বিধানানুসারে বিচার করা অপ্রয়োজনীয়, অথবা ইসলামী আইনকে অচল বা বাতিল মনে করেন তবে তিনি নিঃসন্দেহে কাফির বা অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি ইসলামের নির্দেশকে সঠিক জেনেও জাগতিক লোভ, স্বার্থ, ভয় ইত্যাদি কারণে ইসলাম বিরোধী ফয়সালা দেন তবে তা কুফরী বলে গণ্য হবে না, বরং পাপ বলে গণ্য হবে।[৬০]

যেমন, মদ ইসলামে হারাম ও মদপান প্রমাণিত হলে বেত্রাঘাতের বিধান দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি মদ বৈধ মনে করেন অথবা মদপানের জন্য শাস্তি প্রদানকে সেকেলে বা অমানবিক বিশ্বাস করেন তবে তিনি কাফির বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো বিচারক মদের অবৈধতা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন এবং মদপানের জন্য শাস্তি দেওয়াই সঠিক বলে মনে করেন, দল বা সেনাবাহিনীকে অনুগত রাখার লোভে, শাসক বা আমীরের চাপে, জাগতিক কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য বা পক্ষপাতিত্বের কারণে আইন প্রয়োগ না করেন বা অপরাধীকে শাস্তি না দেন তবে তবে তিনি পাপী বলে গণ্য হবেন, আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার কারী বলে গণ্য হবেন, কিন্তু অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবেন না। বিশেষত যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করছেন, তিনি 'আল্লাহর আইন' অমান্য করলে বা 'আল্লাহর আইনের বাইরে ফয়সালা দিলে' তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিই গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ না তার স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা তার কুফরী প্রমাণিত হবে। এজন্যই উমাইয়া শাসনামলে বসবাসকারী সাহাবীগণ কখনোই এ সকল শাসককে কাফির বলে গণ্য করেন নি। বরং তাদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবং তাদের সাথে সকল প্রকার ইসলামী মু'আমালাত অব্যাহত রেখেছেন। এজন্যই উমার ইবনু আব্দুল আযীয এ সকল শাসককে পাপী ও যালিম বলে স্বীকার করলেও তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করতে অস্বীকার করেন।

৩. ৩. ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যবহারিক-প্রায়োগিক সুন্নাত, বাণী ও সাহাবীগণের মতামত অস্বীকার করে কুরআন মানতে যেয়ে সবচেয়ে মারাত্মক যে বিভ্রান্তিতে খারিজীগণ নিপতিত হয় তা ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন না করা। ফলে তারা তিনটি বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়।

প্রথমত, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মধ্যে পার্থক্য না করা। ফলে তারা কাল্পনিক বা প্রকৃত অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সমাজ বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের আনুগত্য ও সাধারণ পাপীর পাপের সমর্থনের মধ্যে পার্থক্য না করা। ফলে তারা রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের সাধারণ আনুগত্যকে পাপীর আনুগত্য ও পাপের সমর্থন বলে গণ্য করে এই অপরাধে সকল সাধারণ নাগরিক মুসলিমকে কাফির বলে দাবি করে। অথচ

---

[৫৭] আবু হানীফা নুমান ইবনু সাবিত (১৫০হি.), **আল-ফিকহুল আকবার**, মুল্লা কারীর শারহ সহ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪), পৃ. ১১৭; আবু জা'ফর তাহাবী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১হি.), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ, ইবনে আবীল ইজ্জ হানাফীর শারহ সহ, (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮) ৩১৬।

[৫৮] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১২৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/৭৪, ১৪৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১১/১৫৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/৩১০, ৫৫৭, ৬৮৬; ইবনু তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ৭/২১৭-২১৮; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, পৃ. ৪৭-৫৬।

[৫৯] ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ৬০, ৬৩।

[৬০] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৩৪২; তাবারী, মুহাম্মদ বিন জারীর (৩১০হি), জামেউল বায়ান (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৮) ৬/২৫৬; কুরতুবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ (৬৭১ হি), আল- জামে' লি আহকামিল কুরআন (বৈরুত, দার আল-ফিকর, তা.বি.) ৬/১৯০; ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (কায়রো, দার আল-হাদীস, ২য় সংস্করণ, ১৯৯০) ২/৬২-৬৫; ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যা, পৃ. ৩২৩-৩২৪।

www.assunnahtrust.com

সুন্নাতের আলোকে প্রথমটি ইসলাম নির্দেশিত ইবাদত ও দ্বিতীয়টি পাপ ও অন্যায়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ফরয ও ব্যক্তিগত ফরযের মধ্যে পার্থক্য না করা। ফলে তারা বিচার ও জিহাদকে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ইবাদত বলে গণ্য করে ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে জিহাদ পরিচালনার নামে হত্যা, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচ্ছিন্ন কবীলা বা গোত্র কেন্দ্রিক আরব সমাজকে বিশ্বের সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে আনেন। রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও ঐক্য বা 'জামা'আত' রক্ষার জন্য তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কুরআন, হাদীস ও তৎকালীন আরবী ভাষার ব্যবহার অনুসারে 'জামা'আত' অর্থ জনগণ, জনগোষ্ঠি, বা সমাজ (community, society)। হাদীসে 'আল-জামা'আত' বলতে মুসলিম জনগোষ্ঠি ও মুসলিম সমাজ বুঝানো হয়েছে। খারিজীগণ প্রথমে রাষ্ট্র, জামাআত, বাইয়াত এগুলি কিছু মানত না। তারা বলত 'ইমারত বা শাসক বলে কিছু নেই।' পরে যখন এ বিষয়ক হাদীসগুলি তাদেরকে জানানো হলো, তখন তারা নিজেদের দলের ক্ষেত্রেই 'জামা'আত'-এর ধারণা প্রয়োগ করল। নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে আমীর নিযুক্ত করে তার হাতে বাইয়াত করে নিজেরা 'জামা'আত' গঠন করে। জামা'আত অর্থ দল বা গোষ্ঠি নয়, বরং সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজ বা জনগোষ্ঠি। বৃহত্তর সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষুদ্রতর দল বা গোষ্ঠিকে হিযব, কাওম বা ফিরকা বলা হয়, কখনোই জামা'আত বলা হয় না। কুরআন ও হাদীসে জামা'আত বা সমাজবদ্ধতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ফিরকা, হিযব বা দলাদলি নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু খারিজীগণ তাদের দলের বাইরে সকল মুসলিমকে কাফির বলার মাধ্যমে নিজেদেরকেই একমাত্র মুসলিম সমাজ বা জনগোষ্ঠি বলে দাবি করে। এভাবে তারা ঐক্য ও সমাজবদ্ধতার নির্দেশকে বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে।[৬১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে উগ্রতা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমের ব্যক্তি জীবনে ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে যেমন ভুলত্রুটি, পাপ ও ইসলামী বিধান লঙ্ঘন হতে পারে তেমনি রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালনায়ও ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন ঘটতে পারে। ব্যক্তি মুসলিমকে যেমন পাপের কারণে কাফির বলা যায় না, রাষ্ট্রকেও তেমনি পাপ বা অন্যায়ের কারণে 'কাফির' বলা যাবে না বা বিদ্রোহ করা যাবে না। বরং শান্তি পূর্ণভাবে পাপ, অপরাধ বা অন্যায়ের প্রতিবাদ সহ রাষ্ট্রীয় সংহতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية

"কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আতের (মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্রের ঐক্যের বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির সিদ্ধান্তের) বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[৬২]

আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية

"যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা'আত বা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[৬৩]

৬০ হিজরীতে হযরত মু'আবিয়ার (রা) ইন্তেকালের পরে ইয়াযিদ শাসনভার গ্রহণ করেন এবং চার বছর শাসন করে ৬৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তার শাসনামলে ৬৩ হিজরীতে মদীনার অধিবাসীগণ ইয়াযিদের জুলুম-অত্যাচার, ইমাম হুসাইনের শাহাদত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিদ্রোহ করেন। তাদের বিদ্রোহ ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং একান্তই আল্লাহর ওয়াস্তে ও অন্যায় পরিবর্তন ও প্রতিরোধের অনুপ্রেরণা নিয়ে। কিন্তু তা সত্বেও সে সময়ে জীবিত সাহাবীগণ বিদ্রোহে রাজী ছিলেন না। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) মদীনাবাসীদের বিদ্রোহের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু মুতি'র নিকট গমন করেন। তিনি তাকে সম্মানের সাথে বসতে অনুরোধ করেন। ইবনু উমর বলেন: আমি বসতে আসিনি। আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাতে এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

"যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর আপত্তি পাবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নেই সে ব্যক্তি জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[৬৪]

উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

"অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না।)" সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, "না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।"[৬৫]

---

[৬১] ড. আহমদ, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, ৬১-৬২।
[৬২] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬১২; মুসলিম আস-সহীহ ৩/১৪৭৭।
[৬৩] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭৬-১৪৭৭।
[৬৪] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭৮।
[৬৫] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮০, ১৪৮১।

www.assunnahtrust.com

এভাবে আমরা দেখছি যে, যদি কোনো নাগরিক তার সরকারের অন্যায় সমর্থন করেন, অন্যায়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুসরণ করেন তবে তিনি তার সরকারের পাপের ভাগী হবেন। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা, চাকরী, কর্ম বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কারণে কোনো নাগরিক পাপী হবে না। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইউসূফ (আ) কাফির ফিরাউনের অধীনে স্বেচ্ছায় কর্মগ্রহণ করেছেন। এজন্য কোনো অবস্থাতেই তাঁকে ফিরাউনের কুফর, শিরক বা আল্লাহর আইন বিরোধিতায় সহযোগী বলে কল্পনা করা যায় না।

যালিম, পাপী বা অন্যায়ে লিপ্ত শাসক বা প্রশাসকের অন্যায়ের প্রতি আপত্তি সহ তার আনুগত্য বজায় রাখাই ইসলামের নির্দেশ। যালিম বা পাপী শাসক, প্রশাসক বা সরকার যদি পাপের নির্দেশ দেয় তবে তা মান্য করা যাবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও সংহতি বজায় রাখতে হবে। আউফ ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة

"তোমরা হুশিয়ার থাকবে! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক বা প্রশাসক আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজে লিপ্ত হচ্ছেন, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত কর্মকে ঘৃণা করে, কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না।"[৬৬]

অন্য বর্ণনায়:

إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة

"যখন তোমরা তোমাদের শাসক-প্রশাসকগণ থেকে এমন কিছু দেখবে যা তোমরা অপছন্দ কর, তখন তোমরা তার কর্মকে অপছন্দ করবে, কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না।"[৬৭]

আরো অনেক হাদীসে পক্ষপাতিত্ব, যুলুম ও পাপে লিপ্ত শাসক বা সরকারের প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ শাসক বা সরকার কোনো ইসলাম বিরোধী নির্দেশ প্রদান করলে তা পালন করা যাবে না। আবার অন্যায় নির্দেশের কারণে বিদ্রোহ বা অবাধ্যতাও করা যাবে না। বরং রাষ্ট্রীয় সংহতি ও আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। তবে শাসক বা প্রশাসক সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলে বিদ্রোহ বা আনুগত্য পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৬৮]

খিলাফতে রাশিদার পর থেকে সকল ইসলামী রাষ্ট্রেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী বিধিবিধানের কমবেশি লঙ্ঘন ঘটেছে। শাসক নির্বাচন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের পরামর্শ গ্রহণ, জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, মানবাধিকার, আমানত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, নিরপেক্ষভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রয়োগ ইত্যাদি অগণিত ইসলামী নির্দেশনা কম বা বেশি লঙ্ঘিত হয়েছে এসকল রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকগণ নিজেদেরকেই আইন বা আইনদাতা বলে মনে করেছেন। কুরআনী বিধিবিধান ও আইনকে বেপরোয়াভাবে অবহেলা করেছেন। এমনকি সালাতের সময় ও পদ্ধতিও পরিবর্তন করা হয়েছে। উমাইয়া শাসনামলে সাহাবীগণ এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু কখনোই তারা এ কারণে 'রাষ্ট্র' বা সরকারকে জাহিলী, কাফির বা অনৈসলামিক বলে গণ্য করেন নি। বরং তাঁরা সাধ্যমত এদের অন্যায়ের আপত্তি জ্ঞাপন সহ এদের আনুগত্য বহাল রেখেছেন। এদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবং এদের নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালেও কোনো মুসলিম ইমাম, ফকীহ বা আলিম এ কারণে এ সকল রাষ্ট্রকে 'দারুল হরব', 'অনৈসলামিক রাষ্ট্র' বা 'জাহিলী রাষ্ট্র' বলে মনে করেন নি। তারা তাদের সাধ্যমত সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও সংহতি বজায় রেখেছেন।[৬৯] পাশাপাশি তাঁরা সর্বদা শান্তিপূর্ণ পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে উৎসাহ দিতেন এবং জিহাদ বা আদেশ নিষেধের নামে অস্ত্রধারণ, শক্তিপ্রয়োগ, রাষ্ট্রদ্রোহিতার উস্কানি ইত্যাদি নিষেধ করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের অগণিত নির্দেশনা হাদীসগ্রন্থ- সমূহে সংকলিত হয়েছে।[৭০]

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। অন্যায়ের পরিবর্তনের আবেগ, দ্রুত ফল অর্জনের উদ্দীপনা বা অন্যায়ের প্রতি অপ্রতিরোধ্য ঘৃণা ইত্যাদি কারণে আবেগী হয়ে যারা যুদ্ধ, সন্ত্রাস, সহিংসতা বা হঠকারিতার পথ বেছে নিয়েছে তারা কখনোই ইসলামের কোনো কল্যাণ করতে পারেন নি। খারিজীগণ, বাতিনীগণ ও অন্যান্য সন্ত্রাসী বা জঙ্গিবাদী গোষ্ঠি তাদের অনুসারীদের অনেক গরম ও আবেগী কথা বলেছেন এবং অনেক 'পরিবর্তনের' স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু তারা স্বল্প সময়ের কিছু ফিতনা করা ছাড়া কিছুই করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থা অনুসারী আলিমগণ বিদ্রোহ, উগ্রতা ও শক্তিপ্রয়োগ, জোরপূর্বক সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে জনগণ ও সরকারকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে যুগে যুগে মুসলিম সমাজের অবক্ষয় রোধ করেছেন।

৩. ৫. বিচার, জিহাদ, হত্যা ও সন্ত্রাস

সন্ত্রাসের পিছনে তাত্ত্বিক দিকগুলি যাই থাক, সন্ত্রাসের প্রকাশ হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি কর্ম। খারিজীগণ জিহাদকে ব্যক্তিগত ফরয ও ইসলামের রুকন বলে গণ্য করে এবং জিহাদের নামেই তারা এ সকল কর্ম করতে থাকে। আমরা আরো দেখেছি যে, সাহাবীগণ তাদেরকে হত্যার ভয়াবহতা বুঝাতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। কারণ অন্যান্য তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি যাই থাক, হত্যাই কঠিনতম পাপ যা মানুষের পারলৌকিক মুক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়।

৩. ৫. ১. ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যা

বস্তুত সাহাবীগণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত বস্তু মানব জীবন। মানুষকে

---

[৬৬] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮২।
[৬৭] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮১।
[৬৮] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫৮৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৬৭; দানী, আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ১-৬ খণ্ড।
[৬৯] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৩৪, ২৬৫৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৯; ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৩৭৯-৩৮৮।
[৭০] ইবনু আবী শাইবা, (২৩৫হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫) ৭/৫০৮; দানী, আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ২/৩৮৮-৪০৫।

www.assunnahtrust.com

আল্লাহ সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। শুধুমাত্র 'আইনানুগ বিচার' অথবা 'যুদ্ধের ময়দান' ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করা, সন্ত্রস্থ করা, আঘাত করা, কষ্ট দেওয়া বা কোনোভাবে কারো ক্ষতি করা কঠিনতম হারাম কর্ম। এই বিধান সর্বজনীন। কোনো ধর্মের কোনো মানুষকেই উপরের দুটি অবস্থা ছাড়া হত্যা করা, আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়া যাবে না। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে 'মানব রক্ত' কঠিনতম হারাম। একমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে 'মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই' একজন মানুষের হত্যা বৈধ করা হয়েছে। একান্ত প্রয়োজনে বিশেষ মুহূর্তে মানুষের রক্তপাত বৈধ করা হয়। শুধু দুইটি ক্ষেত্রে তা হয়: বিচার ও যুদ্ধ। এই দুটি বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচার, জিহাদ বা হত্যার অনুমতি থাকলে পৃথিবীর বুকে কোনো মানুষই বেঁচে থাকতে পারবে না।

৩. ৫. ২. রাষ্ট্রীয় ফরয বনাম ব্যক্তিগত ফরয

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এজন্য কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের সকল দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান। কোনো বিধান ব্যক্তিগতভাবে পালনীয়, কোনো বিধান সামাজিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত শর্তাদি রয়েছে। কুরআনে 'সালাত' প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার কুরআনে 'চোরের হাত কাটার', 'ব্যভিচারীর বেত্রাঘাতের' ও জিহাদ বা কিতালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ইবাদতটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। অন্য কেউ পালন না করলেও মুমিনকে ব্যক্তিগভাবে পালন করতেই হবে। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্দেশটি 'রাষ্ট্রীয় ভাবে' পালনীয়। কখনোই একজন মুমিন তা ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠিগতভাবে পালন করতে পারেন না।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো ইবাদতের শর্তাবলি কুরআনে কখনোই একত্রে বা একস্থানে উল্লেখ করা হয় নি। এছাড়া অধিকাংশ ইবাদতের সকল শর্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক বিধান বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামগ্রিক জীবন ও এ সকল নির্দেশ পালনে তাঁর রীতি-পদ্ধতি থেকেই সেগুলির শর্ত ও পদ্ধতি বুঝতে হবে। দুই একটি আয়াত বা হাদীস সামনে রেখে মনগড়া অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমেই বিভিন্ন ইসলামী পরিভাষার বিকৃতি ঘটানো হয়। জঙ্গিবাদীরা এভাবেই জিহাদ শব্দের বিকৃতি ঘটিয়েছে।

কুরআনে বারংবার সালাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل

"সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে।"[৭১]

এই নির্দেশের উপর নির্ভর করে যদি কেউ সূর্যাস্তের সময় সালাতে রত হন তবে তিনি নিজে যতই দাবি করুন, মূলত তা ইসলামী ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলে গণ্য হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীস শরীফে 'সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাত্রি পর্যন্ত' সময়ের মধ্যে সালাত আদায়ের বৈধ ও অবৈধ সময় চিহ্নিত করেছেন এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় অবৈধ করেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে কুরআন কারীমের অর্থ বা ব্যাখ্যা করা আমাদেরকে ইবাদতের নামে পাপের মধ্যে লিপ্ত করে।

অনুরূপভাবে কুরআনে 'কিতালের' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এই ইবাদত পালনের অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যন্মধ্যে কতিপয় শর্ত আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। কেউ যদি সেগুলি পূরণ না করে হত্যা, খুন, রক্তপাত ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়ে এগুলি জিহাদ বলে দাবি করেন, তবে তা কখনোই ইসলামী ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলে গণ্য হবে।

শর্ত পূরণ না করে সালাত আদায় করার চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর পাপ শর্ত পূরণ ছাড়াই কতল বা কিতালে লিপ্ত হওয়া। সালাত ও কিতালের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করলে উক্ত ব্যক্তি গোনাহগার হলেও, তাতে কোনো বান্দার হক নষ্ট হবে না। কিন্তু কিতালের সাথে 'বান্দার' হক জড়িত। কাউকে ভীতি প্রদর্শন করা, রক্তপাত করা, হত্যা করা, সম্পদ নষ্ট করা কঠিনতম কবীরা গোনাহ, যা স্বয়ং আল্লাহও ক্ষমা করেন না। কাজেই ইসলামী রাষ্টের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে কাফির রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সাথে ঘোষিত ও আইনানুগ যুদ্ধের বাইরে যদি কেউ হত্যা, আঘাত, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হন, তবে ইবাদত কবুল না হওয়া এবং গোনাহগার হওয়া ছাড়াও তিনি বান্দার হক্ক নষ্ট করার ভয়ঙ্করতম পাপে লিপ্ত হবেন।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কতল ও কিতাল বা হত্যা ও যুদ্ধ মূলত ইসলামে একটি নিষিদ্ধ কর্ম। একান্ত বাধ্য হলে রাষ্ট্র বিচার বা যুদ্ধের মাধ্যমে মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে তা করতে পারে।

৩. ৫. ৩. বিচার ও হত্যা

বিচারের ক্ষেত্রে নরহত্যা, বিবাহিতের ব্যভিচার ও সেচ্ছায় বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ করার পরে ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান আছে। এ জন্য অনেক কঠিন শর্ত রয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় বিচারক সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার। অপরাধের পূর্ণতার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও আর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যাবে না। কারণ, বিচারকের ভুলে নিরপরাধের শাস্তি বা কম অপরাধীর বেশি শাস্তি হওয়ার চেয়ে অপরাধীর মুক্তি বা বেশি অপরাধের কম শাস্তি হওয়া বাঞ্চনীয়।

এই বিচার অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যথাযথ বিচারকের আদালতে যথাযথ সাক্ষ্য, প্রমাণ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে। মুমিনকে ব্যক্তিগতভাবে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে এবং অন্যায়ের পরিবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কখনোই তাকে বিচার করতে বা আইন হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

[৭১] সূরা : ১৭ বানী ইসরাঈল, ৭৮ আয়াত।

www.assunnahtrust.com

"তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পবিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে তার অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করবে, আর এটাই ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।"[৭২]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব, অন্যায় দেখতে পেলে সাধ্য ও সুযোগ মত তার পরিবর্তন বা সংশোধন করা। যেমন মদপান একটি মুনকার বা অন্যায়। কেউ অন্য কাউকে মদপান করতে দেখলে সম্ভব হলে তা 'পরিবর্তন' করবেন। অর্থাৎ তিনি মদপান বন্ধ করবেন। তা সম্ভব না হলে তিনি মুখ দ্বারা তা পরিবর্তন করবেন বা নিষেধ করবেন। তাও সম্ভব না হলে তিনি অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তন করবেন, অর্থাৎ তা পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করবেন বা ঘৃণা করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মুমিন 'মদপানের' অপরাধে উক্ত ব্যক্তিকে বিচার করতে বা শাস্তি দিতে পারবেন না। প্রয়োজনে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে আইনের হাতে সোপর্দ করবেন বা মদপানের ইসলামী শাস্তি প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করবেন।

কাউকে কোনো অপরাধে লিপ্ত দেখে তাকে বিচারকের নিকট সোপর্দ করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কেউ শাস্তি দিতে পারেন না। এই প্রক্রিয়ার বাইরে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান বিচারপতিও কাউকে শাস্তি দিতে পারেন না। উমার (রা) আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা) -কে বলেন, "আপনি শাসক থাকা অবস্থায় যদি কাউকে ব্যভিচারের অপরাধে বা চুরির অপরাধে রত দেখতে পান তাহলে তার বিচারের বিধান কী? (নিজের দেখাতেই কি বিচার করতে পারবেন?)" আব্দুর রাহমান (রা) বলেন, "আপনার সাক্ষ্যও একজন সাধারণ মুসলিমের সাক্ষ্যের সমান।" উমার (রা) বলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন।"[৭৩]

অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান নিজের হাতে বিচার তুলে নিতে পারবেন না। এমনকি তার সাক্ষ্যেরও অতিরিক্ত কোনো মূল্য নেই। রাষ্ট্রপ্রধানের একার সাক্ষ্যে কোনো বিচার হবে না। বিধিমোতাবেক দুইজন বা চারজন সাক্ষীর কমে বিচারক কারো বিচার করতে পারবেন না।

অন্য এক ঘটনায় উমার (রা) রাত্রে মদীনায় ঘোরাফেরা করার সময় একব্যক্তিকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান। তিনি পরদিন সকালে সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান তাহলে তিনি কি শাস্তি প্রদান করতে পারবেন? তখন আলী (রা) বলেন, কখনোই না। আপনি ছাড়া আরো তিনজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী যদি অপরাধের সাক্ষ্য না দেয় তাহলে আপনার উপরে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।[৭৪]

৩. ৫. ৪. জিহাদ ও হত্যা

হত্যার দ্বিতীয় ক্ষেত্র 'জিহাদ'। 'জিহাদ' অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম, কষ্ট ইত্যাদি।[৭৫] আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রতিষ্ঠার সকল প্রকার শ্রম বা প্রচেষ্টাকেই কুরআন ও হাদীসে কখনো কখনো 'জিহাদ' বলা হয়েছে। যেমন, কাফির মুনাফিকদের দাওয়াত দেওয়া ও তাদের অন্যায় কর্মের কঠোর প্রতিবাদ করাকে জিহাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৬] যালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।[৭৭] হজ্জকে জিহাদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।[৭৮] আল্লাহর আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধিমূলক যে কোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে।[৭৯] তবে ইসলামী পরিভাষায় ও ইসলামী ফিক্‌হে জিহাদ বলতে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়। আর এই যুদ্ধেরই নাম কিতাল।[৮০] কুরআন ও হাদীসে জিহাদ ও কিতালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কতল অর্থ হত্যা করা। আর কিতাল অর্থ পরস্পরে যুদ্ধ। এজন্য জিহাদ বা কিতালের মূল শর্ত সামনাসামনি 'যুদ্ধ'। পিছন থেকে হত্যা করা, না জানিয়ে হত্যা করা, গুপ্ত হত্যা করা এগুলি কখনোই ইসলামী কিতাল বা জিহাদ নয়। মদীনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক 'কিতাল' করেছেন। দুই-একটি ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে যথাসম্ভব কম রক্তপাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গোপন অভিযান পারিচালনা করা হলেও যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কাফিরদের দেশে যেয়ে গোপনে হত্যা, সন্ত্রাস, অগ্নি সংযোগ, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি কখনোই তিনি করেন নি বা করার অনুমতি প্রদান করেন নি। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও অযোদ্ধাকে আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

কিতাল বা পারস্পরিক যুদ্ধের ক্ষেত্রেও ইসলাম অগণিত শর্ত আরোপ করেছে। সর্বপ্রথম শর্ত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কিতাল বা জিহাদ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম দা'ওয়াত বা প্রচার। কিতাল প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাওয়াতের মাধ্যমে 'ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে দাওয়াতের ভিত্তিতে মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নিতে আগ্রহী হন। তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের বিরোধিতাকারীরা এই নতুন রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করে। তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের জান, মাল ও

---

[৭২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৯।
[৭৩] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬২২।
[৭৪] আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বাক্‌র সালিহী (৮৫৬হি), আল-কানযুল আকবার (মাক্কা মুকার্‌রামা, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৭) ১/২২৭।
[৭৫] কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন ৩/৫০।
[৭৬] সূরা তাওবা, ৭৩ আয়াত, সূরা ফুরকান, ৫২ আয়াত, সূরা তাহরীম ৯ আয়াত। তাবারী, জামিউল বায়ান ১০/১৮৩। কুরতুবী, আল-জামি ১৩/৫৮।
[৭৭] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৪৭১; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/১২৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৫৫১।
[৭৮] বুখারী, আস-সহীহ ২/৫৫৩, ৩/১০২৬।
[৭৯] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১৬৫; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১১/২০৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৫৪।
[৮০] ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৬/৩; যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২হি), শারহুল মুয়াত্তা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১১) ৩/৩; আযীমআবাদী, মুহাম্মাদ শামসুল হক্ক, আওনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৫হি) ৭/১১১; মুনাবী, আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি), ফাইদুল কাদীর (কাইরো, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, ১ম মুদ্রণ, ১৩৫৬ হি) ২/৩০; সানআনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (৮৫২ হি), সুবুলুস সালাম (বৈরুত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৭৯ হি) ৪/৪১; শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫হি), নাইলুল আওতার (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩) ৮/২৫।

www.assunnahtrust.com

ধর্মীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের বিধান প্রদান করা হয়। এজন্য জিহাদ বা কিতাল বৈধ হওয়ার জন্য 'রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রতি বা 'ইমাম' শর্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

"রাষ্টপ্রধান হলেন ঢাল, যাকে সামনে রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে।"[৮১]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে,

الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براكان أو فاجرا (لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل)

"রাষ্ট্রপ্রধান ধার্মিক হোক আর অধার্মিক হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর আনুগত্যে জিহাদ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব।" অন্য বর্ণনায়: "জালিম শাসকের জুলুম ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা কোনোটিই জিহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধা হবে না।"[৮২]

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে যুদ্ধ বা কিতালে লিপ্ত হন নি। ইয়াযিদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের যুদ্ধ ও উমাইয়া শাসকদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের যুদ্ধ ছিল একান্তই রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। মুআবিয়ার (রা) মৃত্যুর পরে কূফাবাসীগণ ইমাম হুসাইনকে (রা) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাইয়াত করে পত্র লিখেন। তারা ইমাম হুসাইনকেই বৈধ রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইয়াযিদের রাষ্ট্রক্ষমতার দাবি অস্বীকার করেন। এভাবে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ ছিল। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সে সময়ে জীবিত অধিকাংশ সাহাবী এরূপ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের বৈধতা স্বীকার করলেও, এগুলিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। আর সর্বাবস্থায় রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইবের কখনোই কোনো যুদ্ধ তারা বৈধ বলে মনে করেন নি। খারিজীগণের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক হাদীসগুলিতে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খারিজীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে পাবে তারা যেন তাদেরকে হত্যা করে।" সাহাবীগণ এ থেকে কখনোই বুঝেন নি যে, খারিজীদেরকে পেলেই হত্যা করতে হবে। তাঁরা কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্র কোনো সুপরিচিত খারিজী নেতাকেও হত্যা করেন নি।[৮৩]

রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রেও কাউকে হত্যা করার অগণিত শর্ত রয়েছে। যুদ্ধকারী যুদ্ধের জন্য সম্মুখে অস্ত্রসহ উপস্থিত থাকবে। যুদ্ধের আগে তাকে সন্ধি, আত্মসমর্পন, ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া প্রদান ইত্যাদির সুযোগ দিতে হবে। এ সকল শর্ত সহ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের সময় একেবারে অস্ত্রাঘাতের সময়ও যদি কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে তবে তাকে আর আঘাত করা যাবে না। ... ইত্যাদি অগণিত শর্ত বিদ্যমান। একজন ডাক্তার যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা করেন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ না করে চিকিৎসা করার- একান্ত বাধ্য হলেই কেবল তার কোনো অঙ্গ কেটে প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করেন; তেমনি ইসলামে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করার।

জিহাদ বা কিতালের অন্যতম শর্ত, শত্রুপক্ষ রাষ্ট্র আক্রমণ করবে বা তার নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে:

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا

যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"[৮৪]

কিতালের অন্য শর্ত, শুধুমাত্র যারা যুদ্ধ করতে অস্ত্রধারণ করে সামনে এসেছে তাদেরই সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ভালবাসেন না।"[৮৫]

এই নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা, অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছে। যোদ্ধা ছাড়া কারো সাথে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন, আগ্রাসন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশ:

لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع... ولا راهبا... ولا امرأة ولا شيخا كبيرا... ولا تذبحوا بعيرا ولا بقرة إلا لمأكل ... ولا تخربوا عمرانا ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع... وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

যুদ্ধে তোমরা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মজাযককে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো জনপদ ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না...। তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ দয়াকারী- কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।[৮৬]

---

[৮১] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭১।
[৮২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/১৮
[৮৩] ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, পৃ. ৪৭-৫৭।
[৮৪] সূরা ২২: হজ্জ, আয়াত ৩৯।
[৮৫] সূরা ২: বাকারা, আয়াত ১৯০।
[৮৬] বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪) ৯/৯০

www.assunnahtrust.com

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেও যতগুলি আইনানুগ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সবগুলিতেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানি ঘটাতে। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক ও যোদ্ধাদেরও প্রাণহানি কমাতে চেয়েছেন। বস্তুত ইসলাম যুদ্ধকে যে মানবিক রূপ প্রদান করেছে তা অন্য কোনো ধর্মেই পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক ধর্মে, বিশেষত ইহূদী-খৃস্টান ধর্মে যুদ্ধের সময় অযোদ্ধাদের হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে শুধু বৈধই করা হয় নি, উপরন্তু তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইবেলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে বেসামরিক মানুষদের এবং বিশেষ করে সকল পুরুষ শিশুকে এবং সকল বিবাহিত নারীকে নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র কিশোরী কুমারী মেয়েদেরকে ভোগের জন্য জীবিত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো দেশ যুদ্ধ করে দখল করতে পারলে তার সকল পুরুষ অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে এবং নারী ও পশুদেরকে ভোগের জন্য রাখতে হবে। আর সেই দেশ যদি ইহূদীদের দেশের নিকটবর্তী কোনো দেশ হয় তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তথাকার সকল মানুষকে হত্যা করতে হবে। বাইবেলে বলা হয়েছে:

"Kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves."[87] ..."And when the LORD the God hath delivered it tnto thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the swore; but the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat the spoil of thine enemies, which the LORD thy God hath given thee. Thus shalt thou do unto all the cities which are very far from thee, which are not of the cities of these nations. But of the cities of these which the LORD thy God doth give thee for an inheritance, thou shalt save alive nothing that breatheth; but thou shalt utterly destroy them."[88]

৩. ৫. ৫. কাফির যোদ্ধা হত্যা বনাম কাফির হত্যা

কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে 'কাফির-মুশরিকদের' হত্যার অনুমতি বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে খারিজীগণ ধারণা করে যে, কাফির হলেই হত্যা করা যাবে। তাদের এই ধারণা ছিল 'সুন্নাত' বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রয়োগের উপর নির্ভর না করে মনগড়াভাবে কুরআনের অর্থ করার ফল। কুরআনের নির্দেশাবলি সকল আয়াতের সমন্বয়ে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝতে হবে। কুরআনে যেমন কোথাও কোথাও কাফিরদের বা মুশরিকদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যত্র শুধু যুদ্ধরতদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বা যুদ্ধরত 'কাফির' ছাড়া অন্যদেরকে হত্যা করেন নি। তার রাষ্ট্রে অগণিত কাফির সকল নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন। তিনি কখনোই তাদের হত্যা করেন নি বা হত্যার অনুমতি দেন নি। ঈমানের দাবিদার মুনাফিকগণকে তিনি চিনতেন। তাদেরকেও হত্যার অনুমতি তিনি দেন নি। উপরন্তু তিনি অযোদ্ধা সাধারণ অমুসলিম নাগরিককে হত্যা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ও অন্যান্য সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما

"যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা অমুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবেন না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"[৮৯]

৪. উপসংহার

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতিই ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসের জন্ম দিতে পারে। সন্ত্রাস রোধের জন্য ইসলামের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রসার অতীব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সন্ত্রাসী কর্মের প্রতিরোধে সাহাবী ও পরবর্তী যুগের মুসলিম নেতৃবৃন্দের কর্ম থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমরা দেখেছি যে, সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের উৎস, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, মুসলিম সমাজের প্রতি ঢালাও অবজ্ঞা, ঘৃণা, জ্ঞানের অহঙ্কার, ধার্মিকতার অহঙ্কার, ব্যক্তি বা দল বিশেষের জন্য ইসলামের ব্যাখ্যা দানের বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকার ইত্যাদি দাবি করা। আর সন্ত্রাসের প্রকাশ, ঈমানের দাবিদারকে তার কর্মের কারণে কাফির বলে দাবি করা, কাফির হত্যা বৈধ বলে দাবি করা, বিচার বা জিহাদের নামে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির পক্ষ থেকে হত্যা, ধ্বংস, লুণ্ঠন ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হওয়া। যে কোনো দেশে বা যুগে ইসলামের নামে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ প্রচার করতে উপর্যুক্ত বিভ্রান্তিগুলিই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা হবে। কাজেই এগুলি সম্পর্কে মুসলিমদের সচেতন হতে হবে। তা না হলে কোনো ব্যক্তি বা দলের উচ্চাভিলাসের শিকার হয়ে, অথবা ইসলামের শত্রুদের ক্ষপ্পরে পড়ে, অথবা অন্যায়ের প্রতিকারের আগ্রহ, ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দীপনায় অনেক তরুণ ধার্মিক যুবক সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়তে পারে।

মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মত ও পথের উপরে জীবন পরিচালনা তাওফীক প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর দরুদ ও সালাম। আর প্রশংসা জগৎসমূহের পালনকর্তা আল্লাহর নিমিত্ত।

---

[৮৭] The Bible, Numbers 31/17-18.
[৮৮] The Bible, Deuteronomy 20/13-16.
[৮৯] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৫৫, ৬/২৫৩৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৭৮।

www.assunnahtrust.com